ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর বই

বঙ্কিমচন্দ্র

জীবন ও সাহিত্য

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পাব্‌লিকেশনস্‌ ডিভিশন

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের বই

1968

বঙ্কিমচন্দ্র
জীবন ও সাহিত্য

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পাব্লিকেশন্স্ ডিভিশন
মিনিস্ট্রি অব্ ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং
গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, দিল্লী :

নভেম্বর ১৯৬০ (কার্তিক ১৮৮২ শক)
NOVEMBER 1960 (KARTIKA) 1882 (SAKA)

75 nP.

PUBLISHED BY THE DIRECTOR, PUBLICATIONS DIVISION, DELHI-6
AND PRINTED AT ANANDA PRESS, RAM NAGAR, NEW DELHI-1.

পরিচ্ছদ-সূচী

১। সূচনা

(বন্দেমাতরমের ডাক)

বন্দেমাতরম্—এই একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ ক'রে একটি শিশুও একদিন ক্ষেপিয়ে তুলতে পারত জবরদস্ত ইংরেজ রাজপুরুষকে। এই একটি মাত্র ধ্বনির ডাকে সারা দেশের মানুষ জড় হ'ত এসে রাজপথে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। শাসনকার্যের সুবিধে হবে এই অজুহাতে বাংলা দেশকে পূর্ব-পশ্চিমে ভাগ করে দিল ইংরেজ সরকার। সারা বাংলা দেশে শুরু হ'ল বঙ্গ-ভঙ্গ রোধের আন্দোলন। সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ববঙ্গের লেফট্ন্যাণ্ট গভর্ণর ফুলার সাহেব জারি করলেন এক আইন—বন্দেমাতরম্ গান গাওয়া চলবে না। আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। কয়েক বছরের মধ্যেই অবস্থা এমন দাঁড়াল যে বরিশালে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় সভাপতিকে নিয়ে শোভাযাত্রা শেষে শোকযাত্রায় পরিণত হ'ল। বন্দেমাতরম্ গান গাওয়ার অপরাধে উম্মত্ত পুলিশের লাঠিতে রক্তে লাল হ'য়ে গেল বরিশালের রাজপথ। যুবক চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা নির্দয় প্রহারে রাস্তার পাশে খানায় পড়েও অকুতোভয়ে গেয়ে চললেন—বন্দেমাতরম্। সারা বাংলা দেশের মানুষ জেগে উঠল সেই মৃত্যুঞ্জয় মহামন্ত্রের প্রভাবে। বাংলা থেকে সে ডাক ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ভারতবর্ষে।

বন্দেমাতরম্ আজ আসমুদ্র হিমাচল এই বিশাল দেশের সবচেয়ে পবিত্র মন্ত্র। এ ধ্বনি শোনেনি এমন ভারতবাসী কেউ আছে বলে কল্পনা করা যায় না। তেমনি, কে এই মন্ত্রের উদ্‌গাতা ঋষি, তাও ভালোভাবেই জানেন ভারতের শিক্ষিত মানুষ। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অথচ বঙ্কিমচন্দ্র রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক। কিন্তু এমন সাহিত্যই তিনি রচনা করে গেছেন যা দেশবাসীর স্মৃতিভাণ্ডারে অক্ষয় হ'য়ে আছে এখনও। চিরকাল থাকবে।

আর তার কারণও খুব স্পষ্ট। শুধু পাঠকের মনোরঞ্জন করার জন্যেই সাহিত্য-রচনায় মন দেননি তিনি। পাঠকের মনকে তৈরী করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই মহৎ আদর্শ সামনে রেখে একের পর এক চরিত্র সৃষ্টি ক'রে গেছেন তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে। সমালোচনায়, আলোচনায়, ব্যঙ্গরচনায়, অন্যায়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রে গেছেন। পরাধীন দেশের মানুষের যা প্রধান প্রয়োজন সেই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন। ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে গেছেন পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্যে, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে।

তাঁর জীবিতকালে অবশ্য এই চেতনা তেমনভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি লোকান্তরিত হন। তার কিছুকাল পরেই বরোদাপ্রবাসী শ্রীঅরবিন্দ (তখন অরবিন্দ ঘোষ) বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' নামে এক পত্রিকায় সাতটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন ইংরেজীতে। সারা ভারতবর্ষের সম্মুখে তিনি প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী ও তার তাৎপর্য কী, তার ব্যাখ্যা করেন। সেই প্রথম বন্দেমাতরমের

রাজনৈতিক ব্যাখ্যা। তারপর কয়েক বছর ধ'রে বাংলা দেশে শুরু হল বঙ্কিমচন্দ্রকে নতুন আলোকে নতুন রূপে চিনে নেবার পালা। বন্দেমাতরম্ গান যে উপন্যাসের অংগ, সেই 'আনন্দমঠ' হল মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সর্ব দেশভক্তদের গীতা। নতুন উৎসাহে কর্মযোগে মেতে উঠল সারা বাংলার শিক্ষিত মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা তাঁর মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যেই অভাবনীয় সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে দিল।

বাস্তবিকই, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পরবর্তী সময়ে 'বঙ্কিম-প্রসংগে' যা বলেছেন তার সংগে সুর মিলিয়ে আমরাও বলতে পারি—

"বঙ্কিমবাবু যাহা কিছু করিয়াছেন......সব গিয়া এক পথে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমিকে উপাসনা—জন্মভূমিকে মা বলা—জন্মভূমিকে ভালবাসা—জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনি এই যে কার্য করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করে নাই। সুতরাং তিনি আমাদের পূজ্য, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃৎ, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র—বন্দেমাতরম্।"

যিনি আমাদের জাতীয় জীবনে এত বড় স্থান অধিকার করে আছেন, তাঁকে জানা আমাদের মহৎ কর্তব্য। তাঁকে জানলে আমরা নিজেদেরও অনেকখানি জানতে পারব।

২। জন্ম—পিতৃপরিচয়—ছাত্রজীবন

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন কলকাতার কাছে কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যাদবচন্দ্র খুব অল্প বয়সে উড়িষ্যায় গিয়ে ইংরেজ সরকারের অধীনে নিমক মহলে দারোগার কাজ নেন। এ কাজে তিনি খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন।

ন্যায়পরায়ণতা ও চরিত্রবলের জন্যে যাদবচন্দ্রকে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা শ্রদ্ধা করতেন। এই দুটি গুণ পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গিয়েছে। আজ থেকে দেড়শ বছর আগে যাদবচন্দ্র যখন সরকারী কাজ করতেন, তখন তাঁর মতো পরদুঃখকাতর স্বদেশপরায়ণ ব্যক্তি কয়জন ছিলেন বলা কঠিন। তাঁর আত্ম-জীবনীতে যাদবচন্দ্র নিজেই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে গেছেন যা আমাদের মুগ্ধ করে।

একবার ব্রজমোহন ঘোষাল নামে একজন নিমকীর দেওয়ান বালেশ্বর এলাকায় উৎকোচ নিতে থাকেন। তাঁর অপরাধে অন্যান্য অধস্তন কর্মচারীর সঙ্গে যাদব-চন্দ্রেরও বিচার হয়। বালেশ্বর জেলা-শাসক রিকেট সাহেব তাঁর বিচার করেন। এই প্রসঙ্গে যাদবচন্দ্র লিখেছেন—

আমার অপরাধের বিচার জন্য সাহেব আমাকে বালেশ্বরে তলব করিলেন। আমি তিন শত বেহারা মালঙ্গি লইয়া হাজির হইলাম। আমার মুহুরী দুইজনে ভয়ে হাজির হইল না।

সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ঘুস লইয়া থাক?

উত্তর। না; আর ঘুস লইয়া কে কোথায় স্বীকার করিয়া থাকে?

সাহেব আরও রাগিয়া কহিলেন, 'হলপানে হলপ করিয়া বল!'

আমি উত্তর করিলাম, 'মহাপ্রসাদ বা গঙ্গাজল যবন-স্পৃষ্ট হইলে মহত্ত্ব হারায়। এ হলপ লইয়া শতবার বলিতে পারি, যেহেতু ইহার মহত্ত্ব নাই। কিন্তু আসল হলপ, আপনি ধর্মস্বরূপ, আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাহা বলা যায়, তাহা অপেক্ষা অন্য হলপ বড় নয়, শাস্ত্রে এইরূপ বলে।'

সাহেব। তুমি কি পণ্ডিত?

আমি। পণ্ডিত নহি, পণ্ডিত সমাজে বাস করি।

সাহেব। মণ্ডলঘাট পণ্ডিত সমাজ?

আমি। মণ্ডলঘাটে পণ্ডিত লোক আছে বটে, কিন্তু সেটা চাসাগ্রাম। আমার বাসস্থান গঙ্গার ধারে—হুগলির নিকট। তথায় অনেক পণ্ডিত ও সভ্য লোক আছেন।

সাহেব। ব্রজমোহন ঘোষাল তোমার কে?

আমি। কেহ নহে—আমার সঙ্গে কোন সুবাদও নাই। ....

দাদন করিতে করিতে সাহেব মালঙ্গিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা ১৬ কুন্তি খোরাকি নমক পাও; তাহা ওজন ৮/ মণ। আর গাছা নমক ৮/ মণ পাও। এই ১৬/ মণ নমক তোমরা কী কর?'

উত্তর। আমরা খাইয়া থাকি।

সাহেব সহাস্যে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

আমি বলিলাম, 'মালঙ্গি লোক আপন আপন প্রাপ্য একবিন্দুও খায় না; পোক্তানি নমক হইতে দৈনিক খরচ নির্বাহ করিয়া থাকে। খোরাকি নমক বিক্রয় করে।'

সাহেব। তোমার জ্ঞানত বিক্রয় হয়?

আমি। হাঁ; বরং আমি আপন দস্তখত মোহরে ছাড় চিঠি দিয়া বিক্রয় করাই।

সাহেব। সরকারের চাকর হইয়া তুমি এরূপ গর্হিত কার্য করিয়া থাক? তোমায় সাসপেন্ড করিলাম।

আমি। আপনি সব করিতে পারেন, কিন্তু আমার বক্তব্য শেষ করিতে দিতে আজ্ঞা হয়।

সাহেব। কি, বল।

আমি। মালঙ্গি লোক অতি দুঃখী; পরিধানে বস্ত্র নাই—এক টুকরা ন্যাকড়া অবলম্বন; দেহে বা কেশে তেল নাই—রুক্ষ্ম অপরিষ্কার; আহার্য—ভাত, পুঁইডাঁটা, কাঁকড়া আর লবণ। আট মাস পোক্তানে থাকে, চারি মাস ছুটি পায়। এই চারি মাস ঘরে গিয়া চাষ করে। জমিদার খাজনার জন্য পীড়ন করিলে চাষের ধান্য বিক্রয় করিয়া খাজনা দেয়। তখন আহারের উপায় থাকে না।............

রিকেট সাহেব প্রজাপালক, ন্যায়বান; তিনি ক্ষণকাল আমার প্রতি তীক্ষ্ম নয়নে চাহিয়া মালঙ্গিদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত টাকা এই দারোগাকে ঘুষ দিয়া থাক? আর ইহার উপর তোমাদের কোনো নালিশ আছে?"

সকলে এক জবানে কহিল, 'কোনও নালিশ নাই, আমরা ঘুষ দিই না।'......

সাহেব আমার পানে চাহিয়া কহিলেন, 'তুমি অদ্য মাজুল হইতে, কিন্তু তুমি প্রজাপালক ও সত্যবাদী; যদি তোমার কোনো অপরাধ থাকে, তাহা আমি ক্ষমা করিলাম।'......

এইভাবে ৪২ বৎসর চাকরি করে যাদবচন্দ্র ডেপুটি কালেক্টারের পদে উন্নীত হ'য়ে প্রভূত সম্মানের অধিকারী হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮৭ বৎসর হ'য়েছিল।

যাদবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র গঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। পিতার সৎসাহস তাঁর মধ্যে বাল্যকালেই যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গিয়েছিল।

সেকালে খুব ডাকাতের ভয় ছিল। ডাকাতেরা আগে খবর দিয়েই ডাকাতি করতে আসত। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স দশ এগারো হবে এই সময় একদিন খবর পাওয়া গেল তাঁদের বাড়িতে ডাকাত পড়বে। তাঁর পিতৃদেব তখন কর্মস্থানে ছিলেন। অন্যান্য অভিভাবক যাঁরা বাড়িতে ছিলেন তাঁরা স্থির করলেন, বাড়ির মহিলা ও ছোটো ছেলে-মেয়েরা অন্য বাড়িতে কিছুদিন রাত্রিযাপন করবে। এ ব্যবস্থা শুনে বালক বঙ্কিম বেঁকে বসলেন। তিনি কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে যাবেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র 'বঙ্কিম-জীবনী'তে এর পরের ঘটনা এইভাবে বিবৃত করেছেন—

"পিসেমহাশয় বলিলেন, তবে ডাকাত আসিয়া সকলকে কাটিয়া যাক।"

বঙ্কিম বলিলেন, 'কেন কেটে যাবে? আমাদের বাড়িতে তো অনেক লোক আছে, আর গ্রামের ভেতর বাগ্‌দি যাহারা এক একজন লাঠিয়াল......তাহাদের নিযুক্ত করুন, সাধ্য কি যে ডাকাত আমাদের কেটে যায়।' ......"

শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের পরামর্শ মতোই কাজ হল। এবং ডাকাতরা এসে ফিরে গেল। ঐদিন থেকে গুরুজনেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে "বাঁকা" বলে ডাকতেন।

তাই বলে বঙ্কিমচন্দ্র সব ব্যাপারেই দুঃসাহসী ছিলেন তা নয়। মানুষ মাত্রেরই দুর্বলতা থাকে। তাঁরও ছিল। তিনি রাস্তায় ষাঁড়-গরু দেখলে সভয়ে দূরে সরে যেতেন, মই বেয়ে উপরে উঠতে ভয় পেতেন, ঘোড়ায় চড়তে পারতেন না। ঘোড়ার বিষয়ে তার এত ভয় ছিল যে তিনি অন্যকেও চড়তে দিতেন না। অথচ সেই কৈশোরেই তিনি ডাকাতের ভয়ে ভীত হন নি, কলেজে পড়ার সময় ঝড়-তুফান উপেক্ষা করে গঙ্গা পার হয়ে হুগলীতে যেতেন, কর্মজীবনে গুলিভরা পিস্তলের ভয় অগ্রাহ্য করে একজন অত্যাচারী নীলকর সাহেবকে গ্রেপ্তার করেছিলেন।

আসলে ছেলেবেলা থেকেই তিনি কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। যে কাজ না করলেও চলে তার বিপদের ঝুঁকি তিনি কখনো নিতেন না। কিন্তু যা কর্তব্য বলে বিবেচনা করতেন সে কাজ থেকে বিপদের ভয়েও সরে দাঁড়াতেন না। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর আজীবনই অটুট ছিল।

স্বগ্রাম কাঁঠালপাড়াতেই গ্রাম্য পাঠশালায় হাতে খড়ি হয় বঙ্কিমচন্দ্রের।

শোনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র একদিনেই অক্ষর-পরিচয় শেষ করেছিলেন। তারপর 'অলস' 'অবশ' শিক্ষা করেই গুরুমহাশয়কে বলেছিলেন, "ও দুটো শিখলেই 'যশম' পশম' শেখা হ'য়ে গেল—পাতা উল্টে যান।"

গুরুমশাই সভয়ে বলে উঠেছিলেন—"বাবা বঙ্কিম, এভাবে পড়লে আর কতদিন আমি তোমাকে পড়াতে পারব!"

হয়তো এতে কিছু অতিশয়োক্তি আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মেধা যে অসাধারণ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গ্রামের পড়া শেষ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে গিয়ে ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হন। তারপর এগারো বছর বয়সে কাঁঠালপাড়ায় ফিরে এসে গঙ্গার ওপারে হুগলী কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্তি হন। এখানেই স্কুল ও কলেজে তিনি আট-নয় বছর পড়াশুনা করেন। কলেজের পাঠ্যতালিকার বাইরে অন্যান্য বই পড়েই তিনি বেশী আনন্দ পেতেন। কলেজ গ্রন্থাগারে এমন উল্লেযোগ্য সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ের বই ছিল না যা তিনি পড়েন নি। তিনি বেশিক্ষণ একসঙ্গে পড়তে পারতেন না। কিছুক্ষণ পড়ার পরই পায়চারী করতেন, তারপর আবার পড়তেন। হয়তো পায়চারী করার সময় অধীত বিষয়েরই চিন্তা করতেন। কেননা, জ্ঞান যে তাঁর মজ্জাগত ব্যাপার হ'তে পেরেছিল, পরবর্তী জীবনে তা তো বারে বারেই প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর বিষয়ে লিখেছেন,.........'কি কাব্য বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি ধর্মগ্রন্থ যেখানে যখনই তাঁহার আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন।...........' একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

হুগলী কলেজে তখন একজন শিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুশিক্ষক হিসাবে সারা দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। ঈশানচন্দ্রের কাছেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু কেবল ইংরেজী শিক্ষাই সন্তুষ্ট করেনি বঙ্কিমচন্দ্রকে। সেই সঙ্গে তিনি কাঁঠালপাড়ার শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের কাছে সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করতে থাকেন।

সারাদিন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কলেজে পাঠ-চর্চার পর চার বছর ধ'রে বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে সংস্কৃত সাহিত্য আয়ত্ত করতে থাকেন। তাঁর পরিশ্রমের ক্ষমতা ছিল এই রকমই অসাধারণ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিনিঅর স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজের শিক্ষা শেষ ক'রে কলকাতায় চলে আসেন। বৃত্তির টাকায় তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়তে শুরু করলেন।

সেই বছর থেকে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়। কলকাতার অবস্থা তখন ভীষণ আকার ধারণ করেছে। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব তাঁর আলিপুরের বাসভবন ছেড়ে খাস কলকাতায় এসেছে। দেশী সিপাহীর বদলে ইংরেজ সৈন্য গভর্ণর জেনারেল ক্যানিং-এর গৃহ রক্ষায় নিযুক্ত হ'য়েছে। কোম্পানীর কাগজের দর অসম্ভব রকম কমে গেছে। সকলেই মহা আশঙ্কায় দিনযাপন করছে। চোর-ডাকাতের উপদ্রব বাড়তে শুরু করেছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা কখন কী হয়। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় বাসা ক'রে আইন পড়তে এলেন।

ভয় তিনি বিন্দুমাত্রও পেলেন না, পড়াশুনা যেমন তেমনি চলতে লাগলো। কী ক'রে যেন তিনি বুঝতে পেরেছেন, এই বিদ্রোহে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটবে না। তাই কলেজের ব্যারিষ্টার-অধ্যাপককে মণ্ট্রিণ্ড সাহেবকে একদিন তিনি কথায় কথায় বলতে পেরেছিলেন, "যদি একদিনের জন্য ভাবিতাম, তোমাদের রাজত্ব যাইবে, তাহা হইলে তোমার আইন-পুস্তক গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া বাড়ি চলিয়া যাইতাম।"

বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বুঝে ছিলেন। বিদ্রোহ ব্যর্থ হল। পরের বছর নতুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি· এ· পরীক্ষার প্রবর্তন করল। বঙ্কিমচন্দ্র আইন পড়া ছেড়ে বি· এ· পরীক্ষার জন্যে তৈরী হ'তে লাগলেন।

পরীক্ষা দিয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে তেরজন ছাত্র। পাশ করলেন মাত্র দুইজন। বঙ্কিমচন্দ্র আর বাবু যদুনাথ বসু।

পরীক্ষার ফল দেখে ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদের জন্যে ডেকে পাঠালেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর।

এইভাবে তার ছাত্র জীবন শেষ হল। এ সময়ের কথা তিনি শেষ জীবনে বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছেন—'আমি আপন চেষ্টায়' যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হ'তে কোনো শিক্ষকের কাছে শিখিনি। হুগলী কলেজে এক-আধটু শিখেছিলাম ঈশানবাবুর কাছে। ক্লাসে কখন থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশুনা কখন ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত।......"

যিনি পরবর্তী জীবনে নিজেই লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করবেন, তিনি ক্লাসের বাঁধাগতের পড়াশোনায় তৃপ্ত থাকবেন কী ক'রে! নিজেকে তিনি কঠোর সাধনায় শিক্ষিত ক'রে তুলেছিলেন বলেই, আমাদের জন্যে এক মহান সাহিত্যসম্পদ রেখে যেতে পেরেছেন।

৩। বাল্যরচনা—কবিতাবলী

কর্মজীবন আরম্ভ করার আগে বাল্যকালেই সাহিত্যজীবন শুরু করেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বাংলা সাহিত্য তখন মোটেই উন্নত ছিল না। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময়ে কিছু অনুবাদ ও ভাবানুবাদ প্রকাশ ক'রে বাংল্যা গদ্যের একটা রাস্তা করেছেন বটে। কিন্তু সৃজনধর্মী সাহিত্য অতি শৈশবেই ছিল বলা চলে।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রথী। 'সম্বাদ-প্রভাকর' নামে তাঁর একখানি কাগজ ছিল। এই পত্রিকার প্রভাব ছিল তখন অসামান্য। বহু লেখক এতে কবিতা পাঠাতেন, তার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যাই বেশী। গুপ্ত কবি তাঁদের উৎসাহ দিতেন। আদরের সঙ্গে তাঁদের পাঠানো কবিতা পত্রস্থ করতেন। এতে 'সম্বাদ-প্রভাকর' খুবই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রও 'প্রভাকরে' কবিতা পাঠাতে শুরু করলেন। তাঁর দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সে সময়। একজন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র। অন্যজন দ্বারকানাথ। তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র।

দ্বারকানাথ অল্প বয়সেই মারা যান। অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দীনবন্ধু মিত্র পরে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে যশস্বী হন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও ঘটে তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্ব।

এঁদের তিনজনের কবিতার নমুনা এই রকমঃ—

১। দ্বারকানাথ ঃ—

এখন যেরূপ সাজ প্রকাশিতে হয় লাজ,
তথাপি শুনহ গুণধাম।
ধর্ম ত্রিলোকের স্বামী, তাঁহার তনয়া আমি,
জগতে সতীত্ব মম নাম॥

২। দীনবন্ধু ঃ— (জামাইষষ্ঠী)

তাপ বাড়ে, কমে যত, তপনের তাপ।
রবি অস্ত দেরি দেখে, বাড়িছে বিলাপ॥
—মনের আঁধার যায়, দেখিয়া আঁধার।
নিশিতে প্রণয় নীরে দিবেন সাঁতার॥

৩। বঙ্কিমচন্দ্রঃ— (পতির উক্তি)

অংশ

আমারি লো এ অধীনে, সেই মত একদিনে,
ঘটাইলে প্রাণের রতন।
তুমি লো কমলবন, ছয় পদ্ম সুশোভন,
কর পদ হৃদয় বদন॥
যবে প্রিয়ে মান করি, মজাইলে প্রাণেশ্বরি,
লক্ষ্য করি মুখ শতদল।

গিয়ে তার মধুপানে, তৃপ্ত করিবারে প্রাণে,
অপ্রফুল্ল দেখি সে কমল॥
তাহাতে বঞ্চিলে ছলে, যাই কর শতদলে,
হাতে ধরে ঘুচাইতে মান।
গহনা মৃণালে কাঁটা, অঙ্গুলি যাইল কাটা,
পরে পাদ পদ পড়ি প্রাণ॥
হেলেদুলে সে কমলে, ফুটাইয়া শতদলে
ফিরাইলে প্রাণের ললনা।
শেষে যাই কলিপরে, শোভিছে যা' হৃদি পরে,
দূরে গেল মনের ছলনা॥.........

এই ধরনের অনেক দীর্ঘ কবিতা বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রভাকরে' পাঠান এবং তা সাদরে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন নি। তখন তাঁর বয়স পনের বছরের কম। কিন্তু ঐ বয়সেই তিনি গুপ্ত কবির সাধুবাদ অর্জন করেন। গুপ্ত কবি লিখেছেন—

"বঙ্কিচন্দ্রের বিরচিত কবিতার সুবঙ্কিম ভাব কৌশল সকল অতিশয় সন্তোষ-জনক, ইনি রূপক বর্ণনার ছলে নায়ক নায়িকার কথোপকথনে যে সমস্ত প্রগাঢ়ভাব ব্যক্ত করেন তদ্দৃষ্টে সুপণ্ডিত ভাবুক মাত্রেই প্রীত হইয়া থাকেন। ইনি অতি তরুণ বয়সে অতি প্রবীণ সুরসিক জনের ন্যায় মন হইতে অতি আশ্চর্য নূতন নূতন ভার সকল উদ্ভূত করিতেছেন।".........

এ সময়ে 'কবির লড়াই'-এর অনুকরণে কলেজের ছাত্র-কবিদের মধ্যেও কবিতা রচনার লড়াই শুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে এ লড়াইয়ে যোগ দেন নি। কিন্তু দ্বারকানাথ তাঁকে চট্ট কবি বলে ঠাট্টা করতেন। আর দীনবন্ধুকে তিনি বলতেন শহুরে কবি। দীনবন্ধু তার উত্তরে দ্বারকানাথের নাম দেন বুনো কবি।

বঙ্কিমচন্দ্র এ লড়াইয়ে সোজাসুজি যোগ না দিলেও তাঁর কবিতায় চট্ট, শহুরে আর বুনো কবির উল্লেখ থাকত। "বিষম বিচিত্র নাটক" এ বিষয়ে তাঁর উৎকৃষ্ট রচনা, যদিও তার সবটাই ঠাট্টার সুরে লেখা। একটু নমুনা দেওয়া গেল :—

বুনো-কবি

না প্রভু নহিক আমি অসভ্যের কেহ।
পালিত হোয়েছে শুধু, তাঁর অন্নে দেহ॥
ভুল করে গালাগালি, দিতে যারে তারে।
আশ্রয় লয়েছি এসে, অসভ্য আগারে॥.........ইত্যাদি

চট্ট

বুঝেছি চতুর বটে, বুদ্ধি ঢের ঘটে।
গালি দিয়ে মুখ চাপা, যুক্তিমত বটে॥
আঙ্গুর হইল টক, পেলে না নাগাল।
ভয় খেয়ে সভ্য হলে, লিখিব না গাল॥.........ইত্যাদি

এ সময়ের কবিতাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন নি। কিন্তু এই বয়সেরই আরো কতকগুলি কবিতা আছে, পনের বছরের কিশোরের পক্ষে সেকালে তা প্রায় অসাধ্য সাধনের ব্যাপার ছিল মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই বয়স থেকেই কী পরিমাণ স্বদেশ বৎসল ছিলেন, তাঁর দৃষ্টি যে কতোদূর স্বচ্ছ ছিল তা 'অধঃপতন সঙ্গীত'নামে রচিত কবিতাটির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—

যাব ভাই অধঃপাতে, কে যাইবি আয় সাতে,
কি কাজ বাঙ্গালি নাম রেখে ভূমণ্ডলে ?
লেখাপড়া ভস্ম ছাই, কে কবে শিখেছে ভাই
লইয়া বাঙ্গালি দেহ, এই বঙ্গস্থলে ?
হংসপুচ্ছ লয়ে করে, কেরাণির কাজ করে,
মুন্সেফ চাপরাশি আর ডিপুটী পিয়াদা।
অথবা স্বাধীন হ'য়ে ওকালতি পাশ লয়ে,
সোজাসুজি জুয়াচুরি, শিখিছে জিয়াদা!......ইত্যাদি

এবং কবিতার শেষে লিখেছেন—

মরিবে না? এসো তবে, উন্নতি সাধিয়া যাবে,
লভি নাম পৃথিবীতে, পিতৃ সমতুল!
ছাড়ি দেহ খেলাধূলা, ভাঙ বাদ্যভাণ্ডগুলা
মারি খেদাইয়া দাও, নর্তকীর কুল!

মারিয়া লাঠির বাড়ি, বোতল ভাঙ্গহ পাড়ি,
বাগান ভাঙ্গিয়া ফেল পুকুরের তলে।
সুখ নামে দিয়ে ছাই, দুঃখ সার কর ভাই,
কভু না মুছিবে কেহ, নয়নের জলে,
যতদিন বাঙ্গালীকে লোকে ছি ছি বলে॥

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "ললিতা ও মানস"। এই কাব্য দুটির মধ্যে তাঁর রচনাশক্তি আরো সুসংবদ্ধ হয়। প্রেমের সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধির গভীরতা দেখে তাঁকে পনের-ষোল বছরের কিশোর ব'লে ভাবা যায় না। অথচ ঐ বয়সেরই লেখা—

প্রেমে যার মন বাঁধা, না পারে দিবারে বাধা,
সমুদ্র শিখর নদী বনে।
তবে যদি করে বিধি চির বিরহের বিধি,
তবু স্বর্গ মনের মিলনে॥
কলঙ্ক বিপদ ক্লেশ ঝটিকার ধরি বেশ,
শিরোপরি গরজয়ে যত।

আশ্রয় করিয়া আশা, প্রণয়ীতে ভালবাসা,
প্রণয়ীর প্রাণে বাড়ে তত॥
জ্বালা সয় নিরবধি, সেও ভাল পায় যদি,
একবার আঁখির মিলন।
দুঃখের গভীর বনে, সেই স্বপ্নে সুখ মনে,
প্রেম রীতি কে জানে কেমন॥

এ ছাড়া ছন্দ আর শব্দের ইন্দ্রজালও যথেষ্ট আয়ত্তে এসেছে তাঁর সে সময়ে। যেমন—

চলিল চরণে চন্দ্রবদনী।
ঢলিয়ে ঢলিয়ে মন্দ চরণী।
ঊষার প্রখর তারকাধনী।
চলিল গজেশগামিনী॥
উভয়ে মরেছে হৃদিযাতনে।
উভয়ে পেয়েছে প্রাণরতনে।
কাঁধে কাঁধে ধরি চলে কাননে
গভীর নীরব যামিনী॥... ইত্যাদি।

কিন্তু কবিতা রচনায় তৃপ্তি পাননি বঙ্কিমচন্দ্র। 'ললিতা ও মানস' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তাঁর আঠার বছর বয়সে। তারপর বহুদিন তিনি পাঠক সমাজের কাছ থেকে দূরে অজ্ঞাতবাস করতে থাকেন। সম্ভবত এটা তাঁর প্রস্তুতির কাল। কবিতা ছেড়ে তিনি গদ্যের দিকে মন দিলেন এই সময়। চব্বিশ বছর বয়সে রচনা আরম্ভ করলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। ছাব্বিশে প্রকাশিত হ'ল সে বই। বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হ'ল। কিন্তু সে কথা বলার আগে কোন আবহাওয়ায় তিনি লিখতে শুরু করেন সেটা বলা দরকার। এবং তারো আগে শেষ ক'রে নেওয়া দরকার তাঁর নিজের জীবনের কাহিনী।

৪। কর্মজীবন

বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হ'য়ে প্রথমে যশোহরে আসেন। তার আগেই, প্রায় কিশোর বয়সে তাঁর বিবাহ হ'য়েছিল। সেকালে সেইরকমই রীতি ছিল।

তাঁর স্ত্রী যশোহরে আসেননি। ঠিক একবছর পরে, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কাঁঠালপাড়ায় তিনি মারা যান।

যশোহরে এসে দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে আলাপ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের। তার আগে তাঁরা 'প্রভাকরে' লেখা কবিতার মধ্য দিয়ে পরিচিত ছিলেন। দেখা হল এই প্রথম। দুজনেই পরস্পরের প্রতিভার অনুরাগী ছিলেন। ফলে বন্ধুত্ব হ'তে বেশী দেরি হ'ল না, এবং সে বন্ধুত্ব আজীবন অটুট ছিল।

দীনবন্ধু ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়। কিন্তু বয়সের বাধা তাঁর কাছে কোনো বাধাই ছিল না। হাস্য-পরিহাস ছিল তাঁর দুর্মর অভ্যাস। অতি সহজেই আপন ক'রে নিলেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে। আর বঙ্কিমচন্দ্রও এত ভালো-বাসতেন তাঁকে যে দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরও তা তিনি ভুলতে পারেন নি। এবং দীনবন্ধুর পুত্রদের ডেকে তাদের পিতার রচনাবলী প্রকাশ করার ব্যবস্থা ক'রে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তার ভূমিকা লিখে দেন।

যশোহর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র নাগোয়াতে বদ্‌লি হন। মেদিনীপুর জেলায় কাঁথির নাম অনেকেই জানেন। নাগোয়া কাঁথিরই কাছাকাছি, এবং আগে মহকুমা শহর স্থাপিত হ'য়েছিল এখানেই। তারপর জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর ব'লে কাঁথিতে মহকুমা উঠে যায়।

যখন তিনি নাগোয়ায় ছিলেন, তখন সমুদ্রতীরে চাঁদপুর ডাকবাংলোয় বাস করার সময় একজন কাপালিক সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে রাত্রিকালে দেখা করতে আসত। কাপালিক বঙ্কিমচন্দ্রকে রোজই সমুদ্রতীরের জঙ্গলের মধ্যে তার আশ্রমে নিয়ে যেতে চাইত।

সে অনুরোধ বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষা করেননি অবশ্য, কিন্তু কাপালিক তাঁর মনে ছাপ রেখে যায়। ঐ সময় কয়েক দিনের ছুটিতে তিনি বাড়ি এসেছিলেন। দীনবন্ধুও তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন তখন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেন,—

"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আসে, তবে সমাজ-সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে ও তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?"

সেই সময় সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। এবং শচীশচন্দ্রই 'বঙ্কিম-জীবনী'তে এ ঘটনার কথা লিখে গেছেন।

সঞ্জীবচন্দ্র খুব রসিকতা-প্রিয় ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, 'যদি দরিদ্র ঘরে

তাহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে মেয়েটা চোর হইবে। বন জঙ্গলে ভাল দ্রব্য খাইতে পাইত না, সমাজে আসিয়া ভাল খাদ্য-দ্রব্যাদি দেখিয়া বড় লোভী হইবে। দরিদ্র ঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের ঘরের চুরি করিয়া খাইবে। অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া পরিবে।"

তারপর ঠাট্টা ছেড়ে আবার বললেন, "কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে, পরে সন্তানাদি হইলে, স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে, সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।"

দীনবন্ধু কোনো মতামত প্রকাশ করলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের কথা তেমন পছন্দ হ'ল না। বছর দুই পরে তার উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হল। এতে তিনি ভিন্ন সিদ্ধান্তই প্রকাশ করেছিলেন।

নাগোয়ার কাপালিক এবং সমুদ্রতীরের স্মৃতি 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে অমরতা লাভ করল।

আটমাস নাগোয়ায় কাজ করার পর বঙ্কিমচন্দ্র খুলনাতে বদলি হন। খুলনা তখন পৃথক জেলা হয়নি। যশোহরেরই একটি মহকুমা ছিল।

খুলনায় তখন ঘোরতর অরাজকতা চলছিল।

সে সময় দেশে নীলের চাষ হত। নীলকর সাহেবরা বাংলা দেশে বড় বড় জমিদারী দখল ক'রে অবাধে অত্যাচার চালাতেন চাষীদের উপর। তাঁরা রাজার জাত। কাজেই আইনও তাঁদের পক্ষেই। কোনো অপরাধেই তাঁদের কোনো বিচার হয় না। ফলে নিজেরাই তারা একত্র ক'জন রাজা হ'য়ে বসলেন দেশে। সারা বাংলা-দেশের সহায়হীন কৃষক-প্রজা অত্যাচারে আর্তনাদ ক'রে উঠল।

সেই আর্তনাদের বাণীমূর্তি হল দীনবন্ধু মিত্রের কালজয়ী নাটক 'নীলদর্পণ'।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় আসেন তখন 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হ'য়েছে। পাদ্রী লং সাহেবের বেনামীতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আপত্তিকর পুস্তক অনুবাদের অভিযোগে লং সাহেবের নামে মামলা তখনো আদালতে ওঠেনি। আবহাওয়া চারদিকে অবশ্য খুবই গরম।

কিছুদিনের মধ্যেই এ মকর্দমা আদালতে উঠল। এবং লং সাহেবের এক হাজার টাকা জরিমানা হল। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ সঙ্গে সঙ্গেই সে জরিমানা দিয়ে দিলেন।

কিন্তু নীলকর জমিদারদের সাহস খুবই বেড়ে গেল। তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগল।

এই সময় খুলনায় মরেল নামে একজন নীলকর জমিদার ছিল। নিজের নামে একটা শহর বসিয়ে তিনি তার নাম রাখেন 'মরেলগঞ্জ'। তখনকার ছোটোলাট স্যার জে পি গ্র্যান্ড তাঁর Indigo Minutes-এ এই মরেলের খুব তারিফ করে লিখে গেছেন—তিনি একজন আদর্শ নীলকর। "He is a model settler and an example to all Indigo planters." কিন্তু এই আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিটি কী রকম সুকর্মের আদর্শ ছিল, তা ভাবতেও স্তম্ভিত হ'তে হয়।

মরেলগঞ্জে মরেল সাহেব ছিল মুকুটহীন রাজা। তার পাঁচশ লাঠিয়াল ছিল, বন্দুকধারী সৈন্যও ছিল বিস্তর। এই দলের কর্তা ছিল হিলি নামে একজন ফৌজী সাহেব।

একদিন রাত থাকতে হিলির নায়কত্বে প্রায় তিনশ লোক বড়খালি গ্রামের ঘাটে নৌবহর থেকে নামল। গ্রামের লোকের অপরাধ, তারা খাজনা দিতে পারে না। খোরাকীর ধানে কুলিয়ে উঠতে পারে না বলে বেশীর ভাগ জমিতে নীলের চাষ করতে চয় না। গ্রামের সব লোক একমত, একপ্রাণ। কাজেই মরেল সাহেব হিলির কর্তৃত্বে ১২ নৌকো লোক পাঠালেন তাদের একটু শাসন করার জন্যে।

মহকুমা শাসক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে আগেই সংবাদ এসেছিল যে হিলি সাহেবেরা গণ্ডগোলের চেষ্টায় আছে। কিন্তু কোথায় গণ্ডগোল বাধাবে তা হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না। ইতিমধ্যে সংবাদ রটল যে সরুলিয়া গ্রাম আক্রান্ত হবে। বঙ্কিমচন্দ্র সেইদিকে পুলিশ পাঠালেন। এদিকে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে নিপুণ রণনায়কের মতো রাত্রির অন্ধকারে হিলি বড়খালি আক্রমণ করল।

গ্রামবাসীরাও তৈরী ছিল। তারাও লাঠি সড়কী নিয়ে বাধা দিতে এগোল। কিন্তু সাহেবের লোকেরা সংখ্যায় বেশি, অস্ত্রবলও তাদেরই পক্ষে। গ্রামের লোকেরা একটু থমকে দাঁড়াল। রহিমউল্লা নামে একজন পাঠান ছিল গাঁয়ের মাতব্বর। সে কিন্তু পিছ পা হল না, সাহেবদের আক্রমণ ঠেকাতে ছুটল। কয়েকজন লাঠিয়াল তার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই হিলি তাকে লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ল। রহিমউল্লা আহত হল। এবং ছুটে পালালো।.

সে যখন নিজের বাড়িতে বসে ক্ষতস্থান কাপড় দিয়ে বাঁধছিল তখন হিলির বন্দুক থেকে আর একটি গুলি এসে তার বুকে লাগে। সে মারা যায়।

মাতব্বর মারা যেতেই গাঁয়ের লোকেরা যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। সাহেবের লোকেরা তখন মহা উল্লাসে লুঠপাট করে বাড়িতে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগল। যাকে সামনে পেল তাকেই তারা মারতে লাগল, অল্পবয়সী মেয়েরা হল বন্দিনী। এ দলে রহিমউল্লার স্ত্রী-বোনও ছিল। তাদের এবং রহিমউল্লার মৃতদেহ নিয়ে তারা বিজয়দর্পে ফিরে গেল কয়েক ঘণ্টা পরে।

বড়খালি গ্রাম শ্মশানের মতো পড়ে রইল। সেখানে যে মানুষের বসতি ছিল তা বোঝাই দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠল।

খবর শুনে বঙ্কিমচন্দ্র স্থির থাকতে পারলেন না। তখনি তিনি পুলিশ নিয়ে নিজে তদন্ত করার জন্যে মরেলগঞ্জে উপস্থিত হলেন। এসে দেখেন মরেল, হিলি ইত্যাদি সাহেবরা পালিয়েছে। আছে কয়েকজন লাঠিয়াল। হিলির নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে বঙ্কিমচন্দ্র লাঠিয়ালের সর্দার দৌলত চৌকিদার সহ ৩৪ জনকে বিচারের জন্যে দায়রায় সোপর্দ করলেন।

বিচারে দৌলতের ফাঁসি এবং অন্যান্য সকলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হল।

সাহেবরা কিন্তু তখনও পলাতক। মরেল পালিয়ে বিলাতে চলে গেল। হিলিও বোম্বাই থেকে ছদ্মবেশে পালাচ্ছিল, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলে গেল। কিন্তু রহিমউল্লার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি বলে শেষ পর্যন্ত খালাস পেল সে।

যাই হোক, এই ঘটনার পর বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতিও যেমন বাড়ল, বিপদও তেমনি বাড়ল। খুলনায় রাষ্ট্র হল তাঁকে মারার জন্যে ষড়যন্ত্র চলছে। যে তাঁকে খুন ক'রে ফেলতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে এমন ঘোষণার কথাও শোনা গেল। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না। যেমন কাজ করছিলেন, করে যেতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে একদিন এক পকেটে এক লক্ষ টাকা ও অন্য পকেটে রিভলবার নিয়ে এক সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে দেখা করতে এল। সাহেব ঐ জিনিস দুটি টেবিলের উপর রেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোনটা চাও। যদি টাকা নিতে রাজি না হও, এখনি তোমাকে হত্যা করব।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহস যেমন ছিল অসাধারণ, উপস্থিত বুদ্ধিও ছিল তেমনি তীক্ষ্ণ। একটু ভেবে তিনি বললেন, 'তুমি একটু দাঁড়াও। আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে এখনি তোমাকে বলছি।'

এই বলে তিনি পাশের ঘরে গেলেন এবং দরজা বন্ধ করে লোকজনদের ডাকতে লাগলেন। সাহেব পালাতে পথ পেল না।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছু করতে না পেরে সাহেবের লোকেরা তাঁর পেশকারকে পাকড়াও করল একদিন। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে উদ্ধার করার জন্যে পুলিশ পাঠালেন। পরের ঘটনা তখনকার কাগজ 'হরকরা' যা লিখছে তা এই রকম—"Another affray has taken place at Morellgunj. The Police were rather severely handled in an attempt to seize the missing Peshkar."

অনেক চেষ্টার পর বঙ্কিমচন্দ্র তার পেশকারকে উদ্ধার করেছিলেন এবং মরেলগঞ্জের দর্পও চিরদিনের মতো চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হ'য়ে ছোটলাট সাহেব তাঁর মাইনে বাড়িয়ে দিলেন একশ টাকা।

বাইরে এইসব গোলযোগ চলছে। আর ভিতরে বঙ্কিমচন্দ্র পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অবদান 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখে চলছেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ বছর।

খুলনা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র বদলি হয়ে এলেন বারুইপুরে। সেখান থেকে গেলেন ডায়মন্ডহারবারে। তারপর আবার বারুইপুরে। তারপর সরকারী কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের কমিটিতে সেক্রেটারীর কাজ করার পর বদলি হলেন আলীপুরে। এখানে এসে তার তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী' লেখেন। তারপর তিনি গেলেন বহরমপুরে। কিন্তু যাওয়ার আগে আইন পরীক্ষা দিয়ে গেলেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল তিনি প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

বহরমপুরে এসে তিনি আবার পদোন্নতি লাভ করলেন, মাইনেও বাড়ল। এখানে থাকতেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। খালি পায়ে উত্তরীয় গায়ে দিয়ে আদালতে যাতায়াত করতে লাগলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সাহেবরা কী মনে করবে তাতে বিচলিত হলেন না।

বহরমপুরে থাকতে এক সাহেবের সঙ্গে অবশ্য বিবাদ ঘনিয়ে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। এই সাহেবের নাম কর্ণেল ডফিন। তিনি ছিলেন বহরম সেনানিবাসের কম্যান্ডিং অফিসার। একে সাহেব, তার উপর সৈন্যবাহিনীর কর্তা। প্রতিদ্বন্দ্বী যে খুব জাঁদরেল লোক ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। তারই সঙ্গে ঝগড়া বাধল।

সেনানিবাসের সামনের মাঠ দিয়ে একটা সরু পথ ছিল। এই রাস্তা সোজা বলে বঙ্কিমচন্দ্র এই পথেই কাছারিতে যাতায়াত করতেন। কখনো বা হেঁটে কখনো পাল্কীতে।

একদিন তিনি পাল্কী করে বাড়ি ফিরছেন, এই সময় পাল্কীর উপর কার যেন হাতের ধাক্কা লাগল। বঙ্কিমচন্দ্র লাফিয়ে মাটিতে নামলেন। দেখলেন, সামনে একজন সাহেব। এই সাহেবই কর্ণেল ডফিন।

পাল্কী থেকে নেমেই বঙ্কিমচন্দ্র উত্তপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "Who the devil you are ?"

সাহেব তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে দূরে ঠেলে দিল। একটু দূরে আর কয়েকজন সাহেব ক্রিকেট খেলছিল। তার মধ্যে দু-একজনকে বঙ্কিমচন্দ্র চিনতেনও। একজনের নাম ছিল বেনব্রিজ, তিনি জজ সাহেব। তাঁর কাছে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "Have you seen how I have been dealt with by that person ?"

বেনব্রিজ অকূল পাথারে পরে বুদ্ধি খাটিয়ে উত্তর দিল, "O Babu, I am short-sighted—I have not seen anything."

বঙ্কিমচন্দ্র তখন অন্যদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা দেখেছে কিনা।

তারা বলল, দেখেনি।

তখন বঙ্কিমচন্দ্র, "ভাল, আদালতে এই কথা বলবেন," বলে বাড়ি চলে এলেন।

পরদিন সত্যি তিনি মামলা দায়ের করে দিলেন ফৌজদারী আদালতে। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচার। ভদ্রলোক সাহেব হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ছিলেন। কর্ণেলের উপর শমন জারি হল।

কথাটা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল ইতিমধ্যেই। শহরের লোক ডাফিনের বিরুদ্ধে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে সাহেবকে বন্ধ গাড়ীতে লুকিয়ে আদালতে হাজির হ'তে হ'য়েছিল। তবু নাকি তাকে ঢিল খেতে হ'য়েছিল বলে শোনা যায়।

তখনকার দিনে একজন বাংগালী, সাহেবের নামে মামলা করেছে এ একটা অভূত-পূর্ব ব্যাপার ছিল। তার উপর যে-সে সাহেব নয়, খোদ সেনা দলের বড় কর্তা। কাজেই শহরের লোক দলে দলে মামলা দেখতে, বঙ্কিমচন্দ্র আর কর্ণেলকে দেখতে, ছুটে এল আদালতে।

তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার ঘটল। শহরের প্রায় দেড়শ উকিল মোক্তার নিজেরা উপযাজক হ'য়ে বঙ্কিচন্দ্রের ওকালতনামায় সই ক'রে বসলেন। ফলে কর্ণেল সাহেব মহা বিপদে পড়ল। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে যাঁর কাছেই যায় সাহেব তিনিই বলেন, "আমি বঙ্কিমবাবুর ওকালতনামায় সই করেছি।"

কেউ তাকে সমর্থন করছে না দেখে সাহেব ভীত হ'য়ে পড়ল। এবং হাওয়া কোন-দিকে বইছে টের পেয়ে গভর্ণমেণ্টের চৈতন্য হল। কমিশনার উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলেন। বহরমপুরে তখন অনেক সাহেব থাকত। তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শেষে তারা জজ সাহেব বেনব্রিজকে ধরল যাতে বঙ্কিমচন্দ্র মামলা উঠিয়ে নেন।

যাই হোক বেনব্রিজের পরামর্শে কর্ণেল ডাফিন প্রকাশ্য আদালতে বঙ্কিমচন্দ্রের

কাছে ক্ষমা চাইল। সাহেব বলল, "বঙ্কিমবাবু, তোমার যে হাত ধরে সজোরে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, তোমার সেই হাত ধরে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র মামলা উঠিয়ে নিলেন।

তাঁর এই চরিত্রতেজের জন্যে সাহেবরাও তাঁকে ভালোবাসতেন। একবার ছোট-লাট স্যার জর্জ ক্যাম্বেল বহরমপুর পরিদর্শনে আসেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ দেখে তিনি খুসি হ'য়ে বললেন, "স্টিমারে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

সাহেবের নির্দিষ্ট সময়ে গঙ্গার ঘাটে এসে বঙ্কিমচন্দ্র দেখেন, ছোটলাটের স্টিমার 'রোটাস' মাঝ নদীতে নোঙর করা রয়েছে। নৌকো ছাড়া সেখানে যাওয়া যায় না। কিন্তু ঘাটে মাত্র একখানা নৌকো, এবং তাতে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উঠে ছোটলাট-সন্দর্শনে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের ইচ্ছা ছিল না তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এক নৌকোয় যান। হাজার হলেও ডেপুটি তো, মান থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র সেটা বুঝতে পেরে বললেন, "দেখুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে নৌকো ফেরৎ এসে আবার আমি যেতে যেতে অনেক দেরি হ'য়ে যাবে। আমি নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে পৌঁছাতে পারব না।"

তখন ম্যাজিস্ট্রেট চক্ষুলজ্জার খাতিরে রাজি হলেন। কিন্তু শর্ত দিলেন, 'আমি আগে কার্ড পাঠাব ছোটলাটের কাছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র রাজি হ'য়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এক নৌকোতেই 'রোটাস' স্টিমারে এসে পৌঁছালেন। এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে সময় দিয়ে তিনি কার্ড পাঠাতে বিরত রইলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট কার্ড পাঠালেন।

ছোটলাট হয়তো জানলা দিয়ে আগেই এঁদের দেখেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কার্ড পেয়ে তিনি তার অপর পিঠে লিখে পাঠালেন, "তুমি এখন অপেক্ষা কর—ডেপুটি বঙ্কিমবাবুকে আগে পাঠিয়ে দাও।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ছোটলাটের হুকুম দেখলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে সম্মানিত বোধ করলেন। বাস্তবিক সেকালের হিসাবে একজন বাঙালী ডেপুটির পক্ষে এটা সম্মান বৈকি! এরকম সম্মান কয়জনের বরাতে জোটে সন্দেহ।

আত্মসম্মান-জ্ঞান বঙ্কিমচন্দ্রের খুব বেশি ছিল। সেই জন্যেই তিনি সকলের কাছে এত সম্মান পেতেন।

একবার 'বেরা' উৎসব উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। 'বেরা' উৎসব হত গঙ্গার বুকে। রাত্রিবেলা ভাগীরথীর উপর মস্তবড় একটি ভেলা ভাসান হত। ভেলাটি হত ফুলে-পাতায় আলোতে আশ্চর্য রকম সাজানো। তার উপর নর্তকীরা নাচ-গান করত। এই ভেলার চারিদিকে থাকত সম্মানিত অতিথিদের ভেলা। তারপরে অন্যান্য ছোট ছোট ভেলা। তাতে মানুষ থাকত না, থাকত শুধু কলাগাছ আর অসংখ্য আলো।

এ ছাড়া উৎসবের আরো একটা অংগ ছিল নবাবের প্রাসাদে বিরাট ভোজের আয়োজন। জেলার তো বটেই অন্য জেলা থেকেও সাহেব-সুবো নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিতেন ভোজে। বাঙালীরাও নিমন্ত্রিত হতেন। জেলার বড় বড় জমিদার, সরকারী কর্মচারী ও উকিল, বৈদ্যরা আসতেন। কিন্তু বাঙ্গালীদের ভাগ্যে সম্মান ছিল খুবই ফর্দ মাফিক।

সাহেবরা সকলেই একগাছি করে জরির মালা পেতেন। বাঙালীর মধ্যে সাব-জজ দিগম্বর বিশ্বাস এবং উকিল (স্যার) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মালা পেতেন। আর কেউ নয়। তখন দিগম্বরবাবু সাহেবী বেশ ধারণ করতেন এবং গুরুদাসবাবু ছিলেন নবাবের উকিল—এই জন্যেই মালা পেতেন। অন্যান্যদের ভালো করে অভ্যর্থনাও করা হত না।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে এসেই এসব কথা জানতে পেরেছিলেন। কয়েক মাস পরে 'বেরা' উৎসবের সময় নবাবের কর্মচারী তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে এল। তাকে তিনি বললেন, 'আপনি আমায় নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন ব্রাহ্মণ বলে নয়, রাজকর্মচারী বলে। শুনতে পাই, আপনারা নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে রাজকর্মচারীর উপযুক্ত সম্মান দেন না। এ অবস্থায় আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারি না।'

নবাবের কর্মচারী এমন জবাব শোনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে বিস্মিত হ'য়ে কার্ড ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এবং সব কথা দেওয়ান ও নবাবকে জানালো।

তখন নবাবের চক্ষু ফুটল। তাঁর আজ্ঞায় স্বয়ং দেওয়ান এসে বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন, "আমাদের ত্রুটি হয়েছে। ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম হবে না। সাহেবরা যেরকম সম্মান পায়, বাঙালীরাও সেই রকম পাবে।"

তারপর থেকে সত্যিই সাহেব আর বাঙালীরা সমান সম্মান পেয়েছে নবাবের কাছ থেকে।

এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' বলে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি বহরমপুর থেকেই তার সম্পাদকীয় কাজ চালাতেন, কাগজ ছাপা হত প্রথমে কলকাতায়, পরে কাঁঠালপাড়ায়।

'বঙ্গদর্শন' বাংলাভাষায় অভূতপূর্ব পত্রিকা। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হবার পর রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বহরমপুরে এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি 'কপালকুণ্ডলা' ও বঙ্গদর্শনের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে বলেছিলেন, "বাংলা ভাষা এত সুন্দর হ'তে পারে তা আমি আগে জানতাম না।"

বঙ্কিমচন্দ্র তার উত্তরে বলেছিলেন, "বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি যদি তোমার এতই অনুরাগ হয়ে থাকে, তবে তুমি বাংলা লেখ না কেন?"

রমেশচন্দ্র—'আমি বাংলা লিখব? আমি জীবনে কখনো বাংলা লিখিনি। লেখার প্রণালীও জানি না।'

বঙ্কিমচন্দ্র—লেখার প্রণালী আবার কি! তোমার মত শিক্ষিত ব্যক্তি যে ধারায় লিখবে সেই ধারাই প্রণালী।

কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র আবার রমেশচন্দ্রকে বলেছিলেন, "তোমার ইংরাজী রচনা কখনো স্থায়ী হবে না। অন্য লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখ। তোমার খুড়ো মশায় গোবিন্দচন্দ্র, শশীচন্দ্র এবং মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র। গোবিন্দ ও শশী যে সব ইংরেজী কবিতা রচনা করেছেন তা অচিরে লোপ পাবে। কিন্তু মধুসূদন দত্তের বাংলা কবিতা কখনো লোপ পাবে না—বাংলা সাহিত্য যতদিন থাকবে ততোদিন তা বর্তমান থাকবে।"

এ ঘটনার কথা "Dutt's Literature of Bengal"-এ স্থান পেয়েছে। সুতরাং এর সত্যতা অনস্বীকার্য।

এর দুই বছরের মধ্যেই রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা' প্রকাশিত হল। তারপর তাঁর আরো বাংলা রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা সাহিত্যে তিনি স্থায়ী আসন পান।

রমেশচন্দ্রের আবিষ্কার বঙ্কিমচন্দ্রেরই কীর্তি। নিজে তিনি ঠেকে শিখেছিলেন। "Rajmohan's wife" নামে একখানা ইংরেজী উপন্যাস লিখতে শুরু করে শেষ হওয়ার আগেই থেমে যান তিনি। তারপর আর বিদেশী ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেননি। ইংরেজীতে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ, কিন্তু মাতৃভাষায় না লিখলে যে সে রচনা সাহিত্যে স্থায়ী হয় না তা তিনি জীবনের প্রথমেই উপলব্ধি করেছিলেন। এই জ্ঞানলাভে তিনি নিজে যেমন উপকৃত হয়েছিলেন, অন্যকেও তেমনি পথ দেখাতে পেরেছিলেন। এজন্যেও বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছে ঋণী।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবতই একটু দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আত্মপ্রতিভার সম্বন্ধে বিশ্বাসই তাঁর এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কারণ। বহরমপুরে এসে প্রথমের দিকে তিনি কারো সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতেন না। পরে বহু লোকই তাঁর বন্ধু হিসাবে বাড়িতে যাতায়াত করতেন। ক্রমে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

কিন্তু এখানে তাঁর শরীর টিকছিল না। তিনি বদলির জন্যে কমিশনার সাহেবকে অনুরোধ করলেন। কমিশনার তাঁকে খুব প্রীতির চোখে দেখতেন। তিনি তাঁকে ছাড়তে চাইলেন না, ক্যাজুয়েল ছুটি নিতে বললেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, 'ক্যাজুয়েল ছুটি নিয়ে কী হবে। দু'একদিনের ছুটি পথেই ফুরিয়ে যাবে।'

কমিশনার—"তুমি যতোবার ইচ্ছা ছুটি প্রার্থনা কর, আমি কোন আপত্তি না করে তা মঞ্জুর করব।"

সাহেবের ভালোবাসা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ হলেন। কিন্তু তিনি শরীর টিকছে না বলে শেষ পর্যন্ত বদলির জন্যেই বিশেষভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন।

ছোটলাটের সেক্রেটারি ড্যামপিয়ার সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন। তাঁর সহায়তায় অবশেষে ছুটি পেলেন তিনি। ছুটির শেষে বারাসতে কাজে যোগ দিলেন।

বারাসতে বঙ্কিমচন্দ্র অল্পদিনই ছিলেন। শরীর কিছুতেই ভালো যাচ্ছিল না। সেখান থেকে মালদহে বদলী হলেন। কিন্তু সেখানে শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হওয়াতে নয় মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে এলেন।

বাড়িতে বসে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লিখতে লাগলেন।

এর আগে 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি অনেকগুলি উপন্যাস লিখে প্রভূত যশ এবং অর্থ দুইই লাভ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাসিকপত্র 'বঙ্গদর্শন'ও পূর্ণ উদ্যমে চলছে। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের হিসাব রাখতেন, ছাপার কাজ দেখতেন মধ্যম ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র, আর বঙ্কিমচন্দ্র করতেন সম্পাদনা।

ছুটির পর বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে বদলী হলেন। কাঁঠালপাড়া থেকে গঙ্গা পার হয়ে হুগলী এক ঘণ্টার রাস্তা নয়। প্রথমে তিনি বাড়ি থেকেই যাতায়াত করতে

লাগলেন। পরে 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে আত্মীয়বিরোধ উপস্থিত হলে পত্রিকা বন্ধ ক'রে দিয়ে তিনি কাঁঠালপাড়ার বাস উঠিয়ে হুগলীতে চলে যান।

হুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্র পাঁচ বৎসর ছিলেন। এই সময়টা বঙ্কিম প্রতিভার মধ্যাহ্ন-কাল। 'বঙ্গদর্শন' আবার প্রকাশিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র একে একে 'কমলাকান্তের পত্রাবলী,' 'রাজসিংহ', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, 'কমলাকান্তের জবানবন্দী', 'আনন্দমঠ' ইত্যাদি 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে লিখে যেতে লাগলেন। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর যশ সর্বজনে স্বীকৃতি লাভ করল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির কাছেই বর্ষীয়ান সাহিত্যিক ও চিন্তানায়ক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাছে মাঝে মাঝে যেতেন। ভূদেববাবুও কখনো কখনো বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে আসতেন। বয়সের ব্যবধান ডিঙিয়ে এই দুই দিকপাল ব্যক্তির মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়, এবং দুজনে নির্মল হাস্য পরিহাসে বিশ্রামের সময় উপভোগ করতেন।

স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের রসিকতা বোধ ছিল প্রখর। এক-দিন ভূদেববাবুর বাড়িতে তাঁরা দুজনে কথা বলছেন, এমন সময় বাঁশবেড়িয়ার জমিদার ললিতমোহন সিংহ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিখ্যাত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন।

মহেশচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তখনো আলাপ হয়নি। ভূদেববাবু অবশ্য তাঁকে বিলক্ষণ চিনতেন। শ্রাদ্ধের সময় পণ্ডিত ব্যক্তিরা কলসী ইত্যাদি বিদায় পেতেন। ভূদেববাবু ঠাট্টা করে সেই ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, "বোধহয় কোথাও শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়েছে। তাই বুঝি বিদায় মাগতে এসেছে?"

মহেশচন্দ্র সলজ্জে তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, "না না, ললিতবাবুর কাছে একটা বৈষয়িক কাজে এসেছিলাম।"

কথাটা সত্য। তবু ঠাট্টার সুযোগ পেয়ে ললিতবাবু বললেন, "বটে, বটে—এখনি বমাল ধরিয়ে দিতে পারি, গাড়িতে এখনো কলসী মজুত আছে।"

বাস্তবিক গাড়িতে একটা কলসী ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র আর থাকতে পারলেন না। বললেন "অধ্যাপক মশায়, আপনি এখনো যদি শ্রাদ্ধে বিদায়ের কলসী গ্রহণ করেন, তবে সেই সঙ্গে একগাছি দড়িও নেবেন।"

সকলেই হেসে উঠলেন একথা শুনে। এবং সেই থেকে মহেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা স্থাপিত হল।

১৮৮১ খৃস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী থেকে হাওড়ায় বদলি হয়ে এলেন। এসেই হাওড়ার কালেক্টার বাকল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বেধে উঠল। কী উপলক্ষে এই বিবাদ ঘটল এবং তার কী পরিণতি হল সে কথা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করেছেন। তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী' থেকে যা জানা যায় তা এই রকম—

"হাওড়ার মিউনিসিপ্যালিটি হইতে নোটিশ জারি হইল, Combustible পদার্থ দ্বারা কেহ গৃহ আচ্ছাদন করিতে পারিবে না। যদি করে দণ্ডার্হ হইবে। এই নোটিশ প্রথমে ইংরাজিতে লিখিত হয়; পরে বাংলায় অনূদিত হইয়া শহরময় প্রচার করা হয়। অনুবাদ করেন—ডনিথর্ণ সাহেব। তিনি তখন মিউনিসিপ্যালিটির

সেক্রেটারী। অনুবাদটি অতি সুন্দর,—Combustible শব্দের অর্থ করা হইল, জলীয়। তিনি জলীয় কি জ্বলীয় লিখিয়াছিলেন, আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।

"এই 'জলীয়' নোটিশ এক বুড়ির মাথার উপর পড়িল। তাহার একখানি গোলপাতা আচ্ছাদন-যুক্ত ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। বুড়ি লেখাপড়া জানে না; জনৈক প্রতিবেশীকে দিয়া নোটিশ পড়াইল। সে দিগ্‌গজ জাতীয় পণ্ডিত, বৃদ্ধাকে পরামর্শ দিল, জল দিয়া ঘর ছাইও না। বৃদ্ধা আশ্বস্ত হইল। তাহার এবম্প্রকার কোনো অভিপ্রায় ছিল না। সে তাহার গোলপাতার ঘরগুলিকে কোনো রকমে জলযুক্ত হইতে দিল না। আচ্ছাদনটি তখন বেশ Combustible.

"কিছুদিন গত হইতে না হইতে মিউনিসিপ্যালিটির অনুচরেরা বুড়িকে আসিয়া ধরিল। চেয়ারম্যান সাহেব সেই অশীতিপর বৃদ্ধাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট মোকর্দমা বিচারের ভার বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অর্পণ করিলেন।

"বিচার করিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, বৃদ্ধাকে অনর্থক পীড়ন করা হইয়াছে। যে নোটিশের অর্থ বিচারক নিজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, সে নোটিশের অর্থ বুড়ি কিরূপে বুঝিবে? তিনি বৃদ্ধাকে অব্যাহতি দিয়া রায়ে লিখিলেন, "নোটিশের অর্থ বোধগম্য হইল না। নোটিশ insufficient বোধে আসামীকে মুক্তি দিলাম।

......"বুড়ি খালাস পাইল দেখিয়া বাকল্যাণ্ড ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে নথি তলব করিয়া তিনি জাজমেণ্টের উপর মন্তব্য লিখিলেন, "Bankim Chandra's vanity in the knowledge of Bengali language has misled the judgment."

"এই মন্তব্য পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন;এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিলেন, "You are not my judicial superior officer: and you have no right to criticise my judgment." তিনি আরো লিখিলেন, "তুমি যদি এজন্য আমার নিকট এক মাসের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না কর, তাহা হইলে তুমি কাগজপত্র কমিশনার সাহেবের নিকট পাঠাবে।"

"এক মাস গত হইয়া গেল; বাকল্যাণ্ড সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন না—কাগজপত্রও কমিশনারের নিকট পাঠাইলেন না।"

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র কমিশনারের আগমন প্রতীক্ষায় রইলেন। কিছুদিন পরে কমিশনার বিমস্ সাহেব হাওড়া পরিদর্শনে এলে তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত কথা জানালেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের সেরাস্তাদার সে খবর জানতে পেল। সে তখনি ম্যাজিস্ট্রেট বাকল্যাণ্ডকে গিয়ে খবর দিল। বাকল্যাণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি জানতেন, বিচারের রায়ে মন্তব্য লেখা তাঁর বেআইনী কাজ হয়েছে। এদিকে ক্ষমা চাওয়া চলে না। একজন দিশী ডেপুটি যে এ কথা কমিশনারের কানে তুলতে সাহসী হবে তা তিনি ভাবতেই পারেন নি। এখন সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন বিশ্রী চেহারা নিল। মিটমাট না করে নিলে আর মান থাকে না। অথচ তাই বা কী করে হয়।

অনেক ভেবেচিন্তে বাকল্যাণ্ড সেরেস্তাদারকে বলিলেন, "বিকেলে কাছারীর কাজ সেরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠবেন, তখন আমাকে খবর দেবে।"

এরপর বঙ্কিম জীবনীকার শচীনচন্দ্র লিখছেন,—"সেরেস্তাদার তাহাই করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে লইতে যখন গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি ছুটিয়া গিয়া সাহেবকে সংবাদ দিলেন। সাহেব তৎক্ষণাৎ আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বারান্দায় ধরিলেন। বুদ্ধিমান বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাপারটা কি, বুঝিলেন। সাহেব বলিলেন, "Have you seen, Bankim Babu, what remarks I have made about you in my annual reports ?"

বঙ্কিমবাবু—"It is not my habit to enquire what District Magistrates write about me in their reports."

বাকল্যান্ড—"I have spoken very highly of you."

সাহেব একটু মুস্কিলে পড়িলেন; এ রকম কড়া কড়া উত্তর পাইবেন মনে করেন নাই। কথাগুলায় একটা ধন্যবাদ বা একটুও কোমলত্ব নাই। সাহেব তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "বঙ্কিমবাবু, কিছুদিন পূর্বে তোমার জাজমেণ্টের উপর একটা মন্তব্য লিখিয়াছিলাম বলিয়া তুমি কাগজপত্র গবর্ণমেণ্টে পাঠাইতে বলিয়াছিলে; আমি অনুরোধ করিতেছি বঙ্কিমবাবু, তুমি সে পত্র ফিরাইয়া লও।"

বঙ্কিমচন্দ্র। তুমি ক্ষমা (apology) না চাহিলে কিছুতেই ফিরাইয়া লইব না।

সাহেব। ম্যাজিস্ট্রেটের একটা প্রেস্টিজ আছে স্বীকার কর?

বঙ্কিমচন্দ্র। আছে, কিন্তু সকলে তাহা রাখিতে জানে না।

সাহেব। আচ্ছা বঙ্কিমবাবু, এক কাজ করা যাক,—আমি আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করি—তুমিও তোমার পত্র ফিরাইয়া লও।

বঙ্কিমবাবু সম্মত হইলেন। সাহেব তাহার মন্তব্যের নিম্নে লিখিলেন— I regret I passed the above remarks; I withdraw them."

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চিঠি ফিরিয়ে নিলেন। সেই থেকে বাকল্যান্ড সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করিতেন। এবং আজীবন তাঁর হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁর রচিত "Bengal under Leiutenent Governors" বইয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের খুব প্রশংসা ক'রে গেছেন।

কী ভাবে নিজের সম্মান রাখতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তা জানতেন। উপরের ঘটনা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এর কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। তারপর তিনি বাংলা সরকারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুকাল পরে সে পদ উঠে যাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র আলীপুরে বদলি হন। আলীপুরে মাস তিনেক থাকার পর বারাসতে গেলেন। সেখানেও মাস তিনেক ছিলেন। সেখান থেকে ছয় মাসের জন্যে যাজপুরে যান।

এই সময়ে হিষ্টি সাহেবের সঙ্গে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাদানুবাদ শুরু হয়। সেকালে সমস্ত শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু-সংস্কৃতি ও ধর্মের পক্ষে লেখা তাঁর এই চিঠিগুলি মনোযোগ দিয়া পাঠ করতেন। পত্রিকাটির বিক্রি এজন্যে এত বেড়ে গিয়েছিল যে, কখনো কখনো দুবার ক'রে কাগজ ছাপতে হত।

চিঠিগুলির ইংরাজী এত উৎকৃষ্ট ছিল, যুক্তিতর্ক এত সারবান ছিল যে বিয়াক

সাহেব সবিস্ময়ে লোকনাথ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—চিঠিগুলি সত্যিই বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কিনা!

যাজপুর থেকে হাওড়ায় বদলি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এখানে এসে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টম্যাক্‌ট্‌ সাহেবের সঙ্গে আবার বিবাদ বাধল তাঁর।

একটা রেলওয়ে সংক্রান্ত মামলা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে আসে। মামলাটির বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তিনি প্রতিদিন মামলার গতি সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখতেন। শেষে মামলার রায় বের হল। আসামীদের খালাস দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সাহেব মহা খাপ্পা হ'য়ে সোজা বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে এসে হাজির হলেন।

তখন অন্য একটি মামলার বিচার করছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। যেমন কাজ করছিলেন, করে যেতে লাগলেন। সাহেবের সঙ্গে কথা বললেন না, উঠলেনও না। সাহেব প্ল্যাটফর্মের নিচে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্বোধন করে বললেন,, "Bankim Babu, you have let off the accused in the Railway case!"

বঙ্কিমচন্দ্র চেয়ারে বসেই উত্তর দিলেন, "What of that?"

সাহেব। You ought to have convicted the accused.

বঙ্কিমচন্দ্র। You are now uttering what constitutes contempt of court. I now represent Her Majesty."

সাহেব। You have done wrong and you ought to be told so."

বঙ্কিমচন্দ্র আর কোনো উত্তর না দিয়ে সাহেবের বিরুদ্ধে Proceedings লিখতে শুরু করলেন। সাহেব তো একেবারে স্তম্ভিত। একজন দিশী ডেপুটি ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে যাচ্ছে। এদিকে আইনের চোখে ব্যাপারটা যে অন্যায় হ'য়েছে তাও তিনি বুঝতে পারলেন। কাজেই ক্ষমা চাইতে হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবকে ছেড়ে দিলেন।

এইভাবে সাহেবদের সঙ্গে বারবার বিবাদ বাধতে থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র আশঙ্কা করেছিলেন, হয়তো কোনোদিন তাঁকে চাকরীতে ইস্তফা দিতে হতে পারে। তাই তিনি আইন পরীক্ষা দিয়ে রেখেছিলেন, যাতে ওকালতী করতে পারেন। কিন্তু তা তাঁকে করতে হয়নি। কেউ কেউ তাঁর শত্রুতাচরণ করলেও সাহেবদের মধ্যে গুণ-গ্রাহীর সংখ্যাও তাঁর কম ছিল না। চরিত্রগুণে অনেকেই তাঁর বশে এসেছিলেন শেষ পর্যন্ত।

যাই হোক, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বিবাদ বাধায় বঙ্কিমচন্দ্র অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে তিন মাসের ছুটি নিয়ে তিনি কলকাতায় এলেন।

ছুটির পর যোগ দিলেন যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমায়। সেখানে গিয়ে তাঁর জ্বর হল। তিন মাসের ছুটি নিয়ে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে এলেন।

এবার তিনি বদলি হলেন ভদ্রকে। কিন্তু একমাস থেকেই ফিরে এলেন হাওড়ায়। ওয়েস্টম্যাকট সাহেব তখনো হাবড়ায় ম্যাজিস্ট্রেট। পাছে কোনো বিবাদ বাধে এই আশঙ্কায় বঙ্কিমচন্দ্র ছয় মাসের ছুটি নিলেন।

তারপর যোগ দিলেন তিনি মেদিনীপুরে। ছয়মাস মাত্র সেখানে থেকে আবার চার মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলেন তিনি।

ছুটি শেষ হলে বদলি হলেন তিনি আলীপুরে। চাকরী জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন।

আলীপুরে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে। কিছুদিন পর বেকার সাহেব সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে বিবাদ বেধে উঠল।

একটা আবগারির মামলায় বঙ্কিমচন্দ্র আসামীকে কুড়ি পঁচিশ টাকা জরিমানা করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট এসে নথিপত্র দেখে জাজমেণ্টের পাশে মন্তব্য লিখলেন, জরিমানার টাকা কম হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, আসামীরা গরীব মানুষ। দণ্ড যথেষ্ট হয়েছে। এই টাকা দিতেই প্রাণান্ত হবে।

সাহেব। অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড হওয়া উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র আর সামলাতে পারলেন না, বললেন, Sir, you were in cradle when I entered service—

সাহেব হেসে উঠলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি সুনজরে দেখলেন না। পরে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে এজন্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে।

আলীপুরে থাকার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে অনেক বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টার মামলা নিয়ে আসতেন। একবার একজন সাহেব-ব্যারিস্টার এলেন হাইকোর্ট থেকে। তিনি ছিলেন আসামীর পক্ষে। অন্য পক্ষে ছিলেন বিখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী স্যার তারকনাথ পালিত।

বঙ্কিমচন্দ্র তারকনাথকে চিনতেন, কিন্তু সাহেব চিনতেন না। তিনি ভেবেছিলেন, সামান্য একজন দিশী ডেপুটি, এর সামনে আর যুক্তিতর্কের দরকার কী! ভদ্রলোক নানা ভঙ্গীতে ঘুরে ফিরে, কখনো বা টেবিল চাপড়ে খুব কায়দা দেখিয়ে সাক্ষীকে জেরা করতে লাগলেন।

তাঁর আস্ফালনে বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। অন্তঃসারশূন্যতা তিনি কোনো কালেই সহ্য করতে পারতেন না। একটু পরেই সাহেব কী একটা প্রশ্ন করলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষী উত্তর দেবার আগেই বলে উঠলেন—"the question is irrelevant—I disallow it."

সাহেব তো অবাক। এমনভাবে বাধা পাবেন, ভাবতে পারেন নি। সবিস্ময়ে তিনি শুধু পুনরাবৃত্তি করলেন—Irrelevant?

সুযোগ পেয়ে তারকনাথ জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'certainly irrelevant!

সাহেবের অপমানের মাত্রা তখনো পূর্ণ হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র তারকনাথের দিকে চেয়ে, সাহেবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মন্তব্য করলেন, "Don't waste your time on him Mr. Palit."

অর্থাৎ, কেন অবান্তর সেকথা সাহেবকে বুঝিয়ে বলা সময়ের অপব্যয় মাত্র। সাহেবের মাথায় তা ঢুকবে না।

অপমানে সাহেব লাল হয়ে উঠলেন। কিন্তু মুখে আর তাঁর কথা ফুটল না। হাকিম যে কোন ধাতুতে তৈরী তা তিনি এক আঁচড়েই বুঝে নিলেন। তাঁর বাগাড়ম্বর বন্ধ হল।

এই রকম ছোট ছোট কথায় মর্মান্তিক তিরস্কার করতে পারতেন বঙ্কিমচন্দ্র। ছোট কথা, ছোট ছোট কাজের উপরই বেশি গুরুত্ব দিতেন তিনি। তাঁর ধারণা ছিল ছোট ব্যাপারে মানুষকে যতো চেনা যায়, বড় কাজে তেমন যায় না। বড় কাজে মানুষ সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে, ছোট কাজে আসল মানুষটি বেরিয়ে আসে।

মামলার বিচার করতে বসেও এমনি ছোট ছোট কথার উপরই তিনি বেশি নির্ভর করতেন।

একবার এক মামলার বাদীপক্ষের উকিলের জিজ্ঞাসায় সাক্ষী উত্তর দিল, "মুই চেক দিতে দেখেছিলাম।"

সাক্ষী নিরক্ষর, ভদ্রসমাজ থেকে অনেক দূরে তার বাস। কিন্তু তার সাক্ষ্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে উত্তর দিলে, উকিলবাবু খুব উৎফুল হয়ে উঠে হাকিমকে বললেন, 'হুজুর, লিখে রাখুন, সাক্ষী বলছে, সে চেক দিতে দেখেছিল।'

বঙ্কিমচন্দ্রের কিন্তু কেমন খটকা লাগল। সাক্ষীকে তিনি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেন। তারপর, যেন ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিচ্ছেন, এইভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কী দিতে দেখেছিলে?"

সাক্ষী। চেক্ দিতে, হুজুর।

বঙ্কিমচন্দ্র। একথা বলার জন্যে কে তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে?

সাক্ষী। কেউ না, হুজুর।

বঙ্কিমচন্দ্র। চেক কাকে বলে জানো?

সাক্ষী উত্তর না দিয়ে উকিলের দিকে চাইল। এমন প্রশ্নের জন্যে নিঃসন্দেহেই সে প্রস্তুত ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র হাসি গোপন করে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"চ্যাক কাকে বলে জানো?"

সাক্ষী। আজ্ঞে হাঁ হুজুর। খাজনা দিলে জমিদার চ্যাক দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র। ঠিক বলেছ। কিন্তু মামলাটার বিষয়ে তুমি কিছুই জানো না। অন্যে যা শিখিয়ে দিয়েছে তাই বলছ। চেককে তোমরা চ্যাক বল, অন্যে শিখিয়ে দিয়েছে বলেই তুমি চেক বলছ। যাই হোক, এখন সত্যি করে বলতো, কে তোমাকে এসব বলতে শিখিয়ে দিয়েছে? সত্যি না বললে তোমাকে ফৌজদারীতে সোপার্দ করব।"

সাক্ষী তখন কাঁদতে কাঁদতে উকিলবাবুর নাম বলল। উকিলবাবুর অবস্থা আরো কহিল। তিনি মামলা উঠিয়ে নেবার পথ পান না।

একটা ছোট্ট কথায় একটা বড় মোকর্দমার নিষ্পত্তি হল এইভাবে।

কর্মদক্ষতা সত্ত্বেও ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হল না কিছুতেই। কাজেই তিনি অবসর নেবেন স্থির করলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পেন্সনের জন্যে দরখাস্ত করলেন।

কিন্তু তখন বয়স তাঁর মাত্র তিপান্ন বছর। দরখাস্ত নামঞ্জুর হল। অসুস্থ হয়ে না পড়লে পঞ্চান্ন বছরের আগে পেন্সন নেওয়া চলে না। বহুমূত্র ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো অসুখ ছিল না। কিন্তু তাও গুরুতর ধরণের নয়। এমনিতে দেখতে তিনি সুস্থ, সবলকায়ই ছিলেন। কাজেই শরীরের অজুহাত অচল।

এদিকে চাকরী ছাড়বেন বলে মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাধা পেয়ে তাঁর জেদ চেপে গেল। তাঁর স্বভাবই ছিল ঐ রকম। কোনো বাধা সহ্য করতে পারতেন না। বাধাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম না করা পর্যন্ত তিনি শান্তি পেতেন না।

অসুখের ভান করলে অবশ্য সহজেই কাজ উদ্ধার হত। কিন্তু মিথ্যাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাই তিনি ছোটলাট ইলিয়ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন।

ইলিয়ট ও লেডী ইলিয়ট বঙ্কিমচন্দ্রকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। লেডী ইলিয়টের অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কিছু অংশ ইংরাজীতে অনুবাদও করেছিলেন।

লাট সাহেব তাঁর বক্তব্য শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বয়স কত, বঙ্কিমবাবু?"

'তেপান্ন বছর।'

"এই বয়সেই পেন্সন নিতে ইচ্ছা করছ কেন?"

"তেত্রিশ বছর ধ'রে চাকরী করে আসছি, আর পারি না।"

সাহেব। তোমার অসুখ-বিসুখ আছে?

বঙ্কিমচন্দ্র। তেমন গুরুতর কিছু না।

সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি বই লেখার জন্যে অবসর খুঁজছ?"

বঙ্কিমচন্দ্র। তা, একরকম তাই বটে।

সাহেব। বেশ, আমি তোমার পেন্সনের দরখাস্ত মঞ্জুর করব।

তেত্রিশ বছর চাকরি করার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পেন্সন নিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এ পেন্সন মাত্র আড়াই বছর কাল ভোগ করতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু পেন্সনের চেয়ে অনেক বেশি টাকা তখন বইয়ের বিক্রি থেকে পেতেন।

৫। বঙ্কিমপূর্ব বাংলাভাষা ও সাহিত্য

কর্মজীবনে চাকরি সঙ্গে সঙ্গেই লিখতে শুরু করেন বঙ্কিমচন্দ্র। আগে তিনি কবিতা লিখতেন। এবার শুরু করলেন উপন্যাস।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'প্রভাকরে' বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের হাতে খড়ি। গুপ্তকবি ছিলেন সে যুগের সাহিত্যনায়ক। সমসাময়িক জীবনের ছবি তাঁর কবিতায় প্রচুরভাবে উপস্থিত। সরল বর্ণনা ও রসিকতা ছিল তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

লোকচরিত্রের বিষয়ে গুপ্তকবির জ্ঞান ছিল আসাধারণ। 'বঙ্কিমজীবনী' রচয়িতা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গুপ্তকবির দৌহিত্রের মুখে শুনেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে গুপ্তকবি একবার নাকি বলেছিলেন—

"তোমার লিখিবার শক্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তুমি পদ্য না লিখিয়া গদ্য লিখিবে।"

এ উপদেশ কোন সময়ে তিনি দিয়েছিলেন, তা জানা নেই। আর কেনই বা দিয়েছিলেন, তাও অজ্ঞাত। হয়তো যুবক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় তিনি লেখকের মনের গঠন আন্দাজ করেছিলেন। কিম্বা এমনও হ'তে পারে, সেই সময়েই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান, জীবনের খুটিনাটি তথ্যের বিষয়ে সচেতনতা এত প্রগাঢ়ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন যে বুঝতে পেরেছিলেন গদ্য ছাড়া তাঁর লেখক-সত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়।

পরবর্তী জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা দেশে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়। তাতে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তাঁর আরো বেড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া আকৈশোর তিনি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রচুর পড়াশোনা করে এসেছেন। অধীত বিদ্যা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে তাই তিনি এবার নতুন এক সাহিত্য গড়ে তোলার কাজে আত্ম-নিয়োগ করলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ সাধনা থেকে তিনি স'রে দাঁড়াননি।

কিন্তু সে আলোচনা করার আগে বাংলা গদ্যের অবস্থা তখন কী রকম ছিল তা জানা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব তাতে আরো স্পষ্ট হবে।

বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হয় রাজা রামমোহন রায়ের হাতে। কিন্তু সে ছিল যুক্তিতর্কের ভাষা। তাতে সাহিত্যিক গুণ বড় বেশী ছিল না। আর থাকবেই বা কী ক'রে। মানুষের বেলাতে যেমন, ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনি, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই নৃত্যশিক্ষা করতে পারে না। এ ভাষার নমুনা এই রকম—

"আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি করিতেছি। প্রথম, কোনো ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্বদা অনাচারীর নিন্দা করেন, অথচ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসী হয়েন, আর গোপনে নানাবিধ আচরণ করেন; আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্টরূপে ভোজন করে, আপনাকে কোনোমতে সদাচারী দেখায় না, যে দোষ তাহার আছে, তাহা অঙ্গীকার করে।"……

স্বীকার করতে হবে, যথেষ্ট প্রসাদগুণ না থাকলেও এ ভাষা আমরা এখনও বাংলা-ভাষাকে যে অবস্থায় দেখি তার কাছাকাছি। কিন্তু এরই পাশাপাশি পণ্ডিত ব্যক্তিদের ব্যবহৃত আরো এক ধরণের ভাষা চলিত ছিল সে সময়ে, যা এবং বাংলা বলে চেনা যায় না অনেক সময়ে। যেমন 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের এই বাক্যটি—

"কোকিলের কলালাপবাচাল যে মলয়ানিল, সে উচ্ছলচ্ছী করাত্যচ্ছ নির্ঝরান্তঃ কর্ণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

এরপর বাংলা সাহিত্যে সূচনা হয় বিদ্যাসাগরের যুগ। তিনি সংস্কৃত ভাষাকেই অনুসরণ করতেন বটে, কিন্তু তাঁর ভাষার দৃঢ়তা ও সুষমা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতই বলেছেন,

"......বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গলা গদ্য লিখিতে পারেন নাই।......"

বিদ্যাসাগর মশায়ের রচনার দৃষ্টান্ত এইরকম—

"কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে, এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে; যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণ শোধন করিয়া দিতে; সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে।"

এ ভাষার ছন্দ অতি সুন্দর কিন্তু সাহিত্যে সর্বত্র ব্যবহারের উপযোগী কি না সন্দেহ। বিশেষ করে পরবর্তীদের হাতে এ ভাষা আবার সংস্কৃতের দিকে ঝুঁকতে লাগল। তাতে এর দোষগুলি আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠল।

তাছাড়াও অন্য বিপদ ছিল। বিদ্যাসাগর মশায় ভাষা গঠন করেছিলেন বটে কিন্তু তিনি সৃজনমূলক রচনার চেষ্টা করেন নি। তাঁর অনুকারীরা এই অনুবাদ ও ভাবানুবাদের বন্যায় গা ভাসিয়ে দিলেন। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যা বলেছেন, তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। তিনি লিখেছেন—

"বাঙ্গালী লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুগত অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালী লেখকের সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।"......

সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের এই বিষম দুরবস্থার দিনে দেখা দিল প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"। এই উপন্যাসখানি একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত "আলালের ঘরের দুলালে"র ভাষা সহজ, সমস্ত বাঙ্গালীর বোধগম্য। চলতি ভাষায় যে উপন্যাস লেখা যায় তা প্যারীচাঁদ মিত্রই সকলের আগে দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, বিষয়বস্তুর জন্যে "আলালের ঘরের দুলালে"র লেখক ইংরেজী বা সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারস্থ হননি। এই প্রথম একজন বাঙ্গালী লেখক নিজের

সাহিত্য-প্রতিভার উপর নির্ভর করে একখানি উপন্যাস রচনায় সাহসী হলেন। অন্যে কী বলেছে, তাই না বলে নিজের বক্তব্য বলার কৃতিত্ব অর্জন করলেন।

তৃতীয়ত, তিনি শুধু কল্পনাশক্তির আশ্রয় নিয়েই নিজের কাহিনীকে গঠন করেন নি। সমসাময়িক জীবনের উপর ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে তুললেন তাঁর আখ্যায়িকা। অর্থাৎ এতদিনে বাংলা উপন্যাস "criticism of life"-এর দিকে পা বাড়াল।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে প্যারীচাঁদ মিত্রকে অকুণ্ঠভাবে সাধুবাদ জানিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন—

"আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গলা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন;, কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, অন্য কোনো বাংলা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ।".........

অবশ্য প্যারীচাঁদ মিত্র যে আদর্শ গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নন, বঙ্কিমচন্দ্র তাও জানতেন। তারাশঙ্করের "কাদম্বরী"র অনুবাদ যেমন অত্যন্ত সংস্কৃতঘেঁষা, আলালের ঘরের দুলালও তেমনি অত্যন্ত বেশি চলতি ভাষার দিকে ঝুঁকেছে। এই দুই ভাষার উপযুক্ত সংমিশ্রণের ফলেই আদর্শ ভাষার উদ্ভব হওয়া সম্ভব। কেননা ভাষা তো শুধু একটা খোলস নয়, সাহিত্যের অঙ্গই হচ্ছে ভাষা। বিষয়বস্তুর প্রভেদে ভাষারও চেহারা বদলায়। প্যারীচাঁদ মিত্রের কীর্তি হচ্ছে এই যে তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন, প্রতিভা থাকিলে ভাষাকে যেমন অভিপ্রায় সেই অনুসারে চালানো ফেরানো যায়।

আদর্শ বাংলা ভাষা সৃষ্টির গৌরব নিঃসন্দেহেই বঙ্কিমচন্দ্রের। সমসাময়িক অনেকে এজন্যে তাঁকে বিদ্রূপ করেছেন। কেউ বলেছেন, 'শব পোড়া মড়া দাহের ভাষা'। আবার কেউবা আর্তনাদ ক'রে উঠেছেন, 'বঙ্কিমি ভাষা পিতাপুত্র একসঙ্গে পড়া যায় না'। কিন্তু আমরা আজ জানি, বাংলা ভাষা আজ যে ধারায় বয়ে চলেছে বঙ্কিমচন্দ্রই তার ভগীরথ।

তবে কলম ধরেই তিনি এভাষা আবিষ্কার করতে পারেন নি। প্রথম দুখানি উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" আর "কপালকুণ্ডলা"র ভাষা সুন্দর ও কাব্যময় হলেও তেমন সচল নয়। "মৃণালিনী"র ভাষাও প্রায় সেই রকম। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র নিজের ভাষা খুঁজে পেয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করে গেছেন, তার থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাষার তফাৎ তেমন বেশি নয়। এর থেকেই বাংলা ভাষার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কতো গভীর তা অনুমান করা যায়।

অবশ্য শুধু ভাষার কথা বললে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার কথা প্রায় কিছুই বলা হয় না। তাঁর অক্ষয় কীর্তি হচ্ছে উপন্যাসগুলি। ভাব ও ভাষা সেখানে একাত্ম।

৬। উপন্যাসাবলী

(রোমান্স—সামাজিক—অনুশীলনতত্ত্বমূলক)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথমে রোমান্স। কাহিনী এখানে প্রধান, প্রেম হচ্ছে বিশেষ উপজীব্য। এদের মধ্যে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ও কতকাংশে চন্দ্রশেখর উল্লেখযোগ্য।

তারপর সামাজিক উপন্যাসগুলি। প্রেম এখানেও প্রধান, কিন্তু তার মধ্যে সামাজিক সমস্যা দেখা যায়। বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, রজনী এবং কৃষ্ণকান্তের উইল এই দলে পড়ে। এর মধ্যে বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল গুরুত্বপূর্ণ রচনা। অন্যগুলিতে রোমান্সের ভাগই বেশি।

সব শেষে তাঁর অনুশীলনতত্ত্বমূলক উপন্যাস-ত্রয়ী। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এবং সীতারাম।

একখানি উপন্যাসের নাম এ তালিকা থেকে বাদ পড়ল। সে হল রাজসিংহ। খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে যা বোঝায় এখানি সেই জাতীয় রচনা। অন্য বহু উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রীর নাম এবং ইতিহাসের পটভূমি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ধরণের। রাজসিংহে উপন্যাসের আঙ্গিকে ইতিহাসের ব্যাখ্যাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। এবং সেদিক দিয়ে উপন্যাসখানি অতিমাত্রায় সার্থক।

উপরে যে শ্রেণীবিভাগ করা হল, তা কিছুটা শিথিল হ'তে বাধ্য। কেননা প্রেম বা সমাজ বা কোনো উদ্দেশ্যের প্রচার একই রচনায় সংমিশ্রিতভাবে থাকতে পারে। এবং বহু ক্ষেত্রেই তা আছে। এখানে মূল প্রবণতা কোন দিকে সেই কথাই বলা হল শুধু।

(দুর্গেশনন্দিনী)

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী। প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে। লিখিত হয় '৬২—'৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ বছর।

'দুর্গেশনন্দিনী' কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, 'আলালের ঘরের দুলালে'র কথা মনে রেখেই বলা যায়, বাংলা সাহিত্যেরও প্রথম উপন্যাস। 'আলালের ঘরে দুলালে' এত ব্যাপ্তি নেই, উপন্যাস পাঠের স্বাদ নেই। 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই বাঙ্গালী পাঠক প্রথমে একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসপাঠের তৃপ্তি পেল।

প্রকাশিত হওয়ার পর 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাগ্যে নিন্দা-প্রশংসা দুইই জুটেছিল। তবে প্রশংসার ভাগই বেশি।

বিখ্যাত মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র উপন্যাসখানির অনেক প্রশংসা করেও, ভাষার সমালোচনা করেছিলেন। সমালোচনা ক'রে তিনি লিখেছিলেন—

"কয়েকস্থানে গ্রন্থকার "লম্ফ ত্যাগ করিয়া" পদ লিখিয়াছেন, ইহা পরিশুদ্ধ

গৌড়ীয় নহে। লোকে লম্ফ 'প্রদান' করিয়া থাকে, কদাপি ত্যাগ করে না, কেবল পল্লীগ্রামবাসীরা 'লাফ ছাড়িয়া' থাকে, বোধহয় বঙ্কিমবাবু তাহারই অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক তাঁহার গ্রন্থখানি রসব্যঞ্জক, ভাবদ্যোতক ও নূতন প্রণালীর আদর্শস্বরূপ হইয়াছে, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে সম্যক্ সাধুবাদ করিলাম।"

'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বঙ্কিমী-ভাষাকে 'শব পোড়া মড়া দাহ' অর্থাৎ গুরু চণ্ডালী বলে ঠাট্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগিনেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'সোমপ্রকাশে'র মতে সায় দিলেও, প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পরেই বঙ্কিমচন্দ্র কী রকম আলোড়ন এনেছিলেন বাংলা সাহিত্যে তা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামে তাঁর অবিস্মরণীয় পুস্তকে তিনি লিখেছেন—

"আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবা মাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাংলাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই।...... দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।"

সেকালের আরেকজন সাহিত্যসমালোচক চন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, "তখন দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী ও কপালকুণ্ডলা কিনিয়া পড়িলাম। তিনখানি উপন্যাস পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বঙ্কিমবাবু বাংলা সাহিত্যে বিপ্লব সৃষ্টি করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।................"

দুর্গেশনন্দনীতে স্কটের 'আইভ্যানহো' উপন্যাসখানির বিশেষ প্রভাব আছে বলে অনেকে সমালোচনা করেন। এ বিষয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' আলোচনা প্রকাশিত হয়। কাহিনীতে যে অনেকখানি সাদৃশ্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলেছেন, দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে তিনি 'আইভ্যানহো' পড়েননি। চন্দ্রনাথবাবু এবিষয়ে লিখছেন—'দুর্গেশনন্দিনী পড়িয়া মনে হইল, উহা স্কটের আইভানহো পড়িয়া লিখিত। অনেকদিন পরে বঙ্কিমবাবুকে একবার ঐ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার আগে আইভ্যানহো পড়ি নাই।......'

কাশীনাথ দত্ত তার 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গে' এ বিষয়ে লিখেছেন— "আমি তাঁহার Honesty unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি।" আমাদেরও তাই মনে হয়। হয়তো সাদৃশ্য যা আছে তা একান্তই আকস্মিক। ইংরাজীতে যে একটি প্রবচন আছে—মহৎ ব্যক্তিরা একই ধরণে চিন্তা করেন— অনেক সময়েই দেখা গেছে কথাটা ঠিকই। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের আইভ্যানহো না পড়েও একই ধরণের কাহিনী রচনা করেছিলেন।

দুর্গেশনন্দিনী যে খুবই জনপ্রিয় হ'য়েছিল তা বোঝা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই উপন্যাসখানির তেরটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাছাড়া ইংরেজী, হিন্দুস্থানী, হিন্দী এবং কানাড়ী ভাষায় অনুবাদও হয় তাঁর জীবদ্দশাতেই।

(কপালকুণ্ডলা)

'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার পর এক বছরের কিছু বেশি সময়ের ব্যবধানে এই উপন্যাসখানি প্রকাশ লাভ করে। কিন্তু এ কাহিনীর সূত্রপাত যে বহুদিন আগেই হ'য়েছিল তা নাগোয়ায় থাকতে কাপালিক-দর্শন এবং পরে দীনবন্ধু মিত্রের অরণ্যপালিতা বালিকার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা থেকেই ইতিপূর্বে জানা গেছে। অরণ্য পালিতা কন্যা যে লোকালয়ে গিয়ে অন্য নারীর মতো আচরণ করবে, সঞ্জীবচন্দ্রের এ মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের তখন মনঃপূত হয় নি। কপালকুণ্ডলাকে "সৃষ্টিছাড়া এক অপূর্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্তিরূপে" অঙ্কিত ক'রে তিনি নিজের ধারণার বাণীমূর্তি দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র অনুমান করেন, এই উপন্যাসের মতিবিবি চরিত্রটি কোনো গৃহস্থের কুলত্যাগিনী বধূর কাহিনী অবলম্বন করে অঙ্কিত হ'য়েছে। তিনি বলেন, 'ইহার চরিত্রের সঙ্গে মতিবিবির কোনো সাদৃশ্য নাই বটে, কিন্তু ঘটনার সাদৃশ্য আছে।'

প্রকাশিত হওয়ার পরই 'কপালকুণ্ডলা' পাঠকসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগী লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন, "এই উপন্যাস-খানি বাহির হওয়া মাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের যশোরাশি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং ইতিপূর্বে যাঁহারা বাংগালা গ্রন্থকার বলিয়া খ্যাতিপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই যশোজ্যোতিঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল।"

'কপালকুণ্ডলা'র ভাষা ও বর্ণনায় কবিত্বের স্পর্শ আছে। শুধু এ দেশেই নয় বিদেশেও উপন্যাসখানি খুব সমাদর হয়। আর, ডব্লু ফ্রেজার তাঁর Literary History of India-তে এই বইয়ের প্রশংসা করে লিখেছেন, "Outside of Marriage de Loit there is nothing comparable to the Kapalkundala in the history of western fiction."

উপন্যাসখানির ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে একাধিক। অধ্যাপক ক্লেস জার্মান ভাষাতে অনুবাদ করেন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে, এ ছাড়া হিন্দী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু এবং সংস্কৃতেও গ্রন্থখানির অনুবাদ প্রকাশিত হ'য়েছে। নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ 'কপালকুণ্ডলা'র নাট্যরূপ দেন।

আধুনিক কালে সমালোচক গিরিজাপ্রসাদ রায় চৌধুরী 'কপালকুণ্ডলা'র বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এবং দীর্ঘ আলোচনা শেষে আক্ষেপ ক'রে বলেছেন, "........ কিন্তু স্বপ্নময়ী কপালকুণ্ডলাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না। সে বিনাসূতার হার, আকাশের প্রতিমা, ধরিতে গেলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

প্রথম প্রকাশের সময় কপালকুণ্ডলা'র বত্রিশটি পরিচ্ছদ ছিল। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র একটি পরিচ্ছেদ বাদ দেন। বর্তমানে উপন্যাসখানি একত্রিশ পরিচ্ছেদে শেষ হ'য়েছে।

(মৃণালিনী)

তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। উপন্যাসখানির প্রথম দুই পরিচ্ছেদ সপ্তম বা অষ্টম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র পরিত্যাগ করেন। তাতে গ্রন্থখানি আরো দৃঢ় হয়েছে।

প্রথমবার আলীপুরে থাকার সময় দশমাস কাজ করে বঙ্কিমচন্দ্র ছয় মাসের ছুটি নেন। সেই ছুটিতে তিনি 'মৃণালিনী' লেখেন এবং আইন পরীক্ষা দেন।

আগের দু'খানি উপন্যাসের মতো 'মৃণালিনী'ও পাঠক সমাজে আদর লাভ করে। সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'মৃণালিণী' প্রকাশিত হওয়ার পর সমালোচনা করে লেখেন—

"এই প্রকারে বিবিধ গ্রন্থের আলোচনান্তর আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে বঙ্গভাষায় গদ্যে 'মৃণালিনী'র সদৃশ সুচারু গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই; এবং যে কোন ভাষায় গ্রন্থকার ঐরূপ রম্য রচনা নিষ্পন্ন করিলে বিশেষ প্রশংসার ভাজন হইতেন।".........

'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতার প্রথম উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। বখ্তিয়ার খিলজী মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে বাংলা দেশ জয় করেন, বঙ্কিমচন্দ্র একথা বিশ্বাস করতেন না। বাঙালী যে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে এটা তাঁর কাছে অসম্ভব ব্যাপার মনে হয়েছে—কারণ বাঙালীর বীরত্বে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। প্রকৃত ব্যাপার যে উচ্চ-পদের রাজপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতা তা দেখাবার জন্যে তিনি 'মৃণালিনী' উপন্যাস লেখেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা যে অনেকখানি সত্য ছিল তা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ নানা তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন। এ বিষয়ে বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা গবেষক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীতে লক্ষ্মণ সেনের নবদ্বীপ হইতে পলায়নের কথা বিবৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিই প্রথমে সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের অসম্ভবতা প্রমাণের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।........

"......সেই দিনই ইহার সদুত্তর খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই। একার্যে অনেক সময় লাগিয়াছিল। ....যে সকল উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলাম, তাহা 'লক্ষ্মণ সেন ও মুসলমান বিজয়' নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি (বঙ্গদর্শন ১৩১৫)।

"............সুতরাং এখন সকলকেই স্বীকার করিতে হইতেছে যে বখ্তিয়ার বোধ হয় কেবল রাজধানী অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্তের শাসনকালে...... বিশাল বঙ্গদেশের শতক্রোশব্যাপী অংশমাত্র মুসলমানগণের হস্তগত হইয়াছিল।"...

'মৃণালিনী'ও কপালকুণ্ডলার মতো কবিত্বগুণে উৎকৃষ্ট। তাছাড়া গিরিজায়া ও মৃণালিনী চরিত্রদুটির মুখে বঙ্কিমচন্দ্র পদাবলী ও ছড়া শুনিয়েছেন—এতে বোঝা যায় তিনি লোকসঙ্গীত ও বৈষ্ণব-কবিতার ঐশ্বর্যের বিষয়ে সচেতন ছিলেন। এবং বাঙ্গালী সংস্কৃতির ভিত্তি কোথায়, এইভাবে সেদিকে তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছিলেন। সে সময়ের কথা মনে রাখলে বঙ্কিমচন্দ্রে এই ঐতিহ্যচেতনা আশ্চর্যের ব্যাপারই মনে হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থানীতে অনূদিত হয় 'মৃণালিনী'। তার বছর ছয়েক আগেই এর নাট্যরূপ প্রকাশিত হ'য়েছিল।

(বিষবৃক্ষ)

"বিববৃক্ষ" বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ উপন্যাস। বাংলা ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাস থেকে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। 'বিষবৃক্ষ' বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় পর বৎসর, অর্থাৎ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে।

আগের তিনখানি উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসকার হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র নতুন বিষয়ের অবতারণা করলেন।

সুদূর অতীতের কল্পনারাজ্যে বিচরণ ছেড়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পারিপার্শ্বিক সামাজিক জীবনের দিকে চোখ ফেরালেন। তখনকার দিনে সামাজিক সমস্যাগুলির ভিতর প্রাধান্যলাভ করেছিল—বিধবা-বিবাহ এবং বহু-বিবাহ। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিষয়ে আন্দোলন করেছিলেন অনেক আগেই। বঙ্কিমচন্দ্র অসীম সাহসিকতায় সমস্যাদুটিকে সামাজিক পরিবেশে বিচার করতে বসলেন।

তাঁর সিদ্ধান্তের বিষয়ে হয়তো দ্বিমত ঘটতে পারে। বাস্তবিক সিদ্ধান্ত তিনি তেমন কিছু দেনওনি। কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে মহৎ উপকার হল এই যে, তারপর থেকে বাঙালী লেখকগণ নিজের পরিবেশে থেকে সাহিত্যিক উপাদান সংগ্রহে সাহসী হলেন। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালীর নাড়ির যোগ স্থাপিত হল।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা প্রণিধানের যোগ্য। তিনি বলেছেন—

"বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়াছিল সে হচ্ছে 'বিষবৃক্ষ'। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', ও মৃণালিনী' লেখা হ'য়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরাজীতে যাকে বলে রোম্যান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সে দূরত্ব এদের মুখ্য উপকরণ। ....

'বিষবৃক্ষে' কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।"............

এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তিনটি—নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী এবং কুন্দনন্দিনী। এই চরিত্র তিনটির পরস্পর সংঘাতই বিষবৃক্ষের প্রধান ঐশ্বর্য। এদিক থেকে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসেরও সূত্রপাত এই 'বিষবৃক্ষ' থেকেই। এ বইয়ের সূর্যমুখী চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্চর্য সৃষ্টি। অনেকে 'কুন্দনন্দিনীর'ও যথেষ্ট সুখ্যাতি করেছেন। দুটি চরিত্রের প্রতিই ঔপন্যাসিকের মনোযোগ সমান তীক্ষ্ণ ছিল।

অনেকে হয়তো জানেন না 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের অনেকখানি ছায়াপাত ঘটেছে। সমালোচক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার একবার বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে-

ছিলেন। তার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন— "কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হইয়াছে।"

শ্রীশচন্দ্র কুন্দনন্দিনী চরিত্রের বিশ্লেষণ করে অনেক প্রশংসা করেছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' থেকেও বোঝা যায় বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের ছায়া আছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দেখা করতে যান। কথা প্রসঙ্গে কবি বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছু প'ড়ে শোনাতে বলেন। তারপর নবীনচন্দ্র লিখছেন—

"তিনি কি পড়িবেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্ষয়বাবু (অক্ষয়চন্দ্র সরকার) আমাকে আগেই শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—'বিষবৃক্ষ'। তিনি—'কোন্ স্থানে পড়িব?' আমি—'যে স্থান আপনার অভিরুচি।' তিনি—'বিষবৃক্ষ' খুলিয়া যেখানে কমলমণির কাছে সূর্যমুখী তাঁহার পতিপ্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন সেস্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন—'বিষবৃক্ষ' আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও তো পড়ি।' আমাকে অক্ষয়বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাহাকে 'নভেলিষ্ট' করিয়াছে। তিনিই সূর্যমুখী।"

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ করেন। তখন নবীনচন্দ্র অনুযোগ করেন যে, কুন্দনন্দিনীর চরিত্র সৃষ্টি করে অবাধ প্রেমের প্রচারে দেশের অপকার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। নবীনচন্দ্র লিখেছেন, ঘরে দেয়ালে টাঙানো তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার অয়েল-পেইন্টিঙের দিকে চেয়ে থাকলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর দুই চোখ অশ্রুসজল হ'য়ে উঠল। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, "এই কন্যাটিও কুন্দনন্দিনীর হতভাগ্য অনুকরণ করিয়াছিল।"

'বিষবৃক্ষ' বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ছোটলাট ইলিয়ট সাহেবের স্ত্রীকে উপহার দেওয়ার জন্যে এর কিছু অংশ The Bane of life নাম দিয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মিরিয়াম এস্. লাইট এর পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী অনুবাদ করেন। তার ভূমিকায় স্যার এডউইন আর্নল্ড উপন্যাসখানির যথেষ্ট প্রশংসা করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে শিয়ালকোট থেকে এর হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সুইডিশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্যে 'বিষবৃক্ষে'র নাট্যরূপ দেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। বহুবার অভিনীত হয়েছে সেই নাট্যরূপ।

বাংলা সাহিত্যে 'বিষবৃক্ষ' বহুপঠিত, বহু আলোচিত গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই এর আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হ'য়েছিল।

(ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী ও রজনী)

'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বছরের চৈত্র সংখ্যায় ইন্দিরা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। আধুনিক বিচারে তাকে ছোটগল্প বলা চলে। বোধকরি বাংলা সাহিত্যেও ছোটগল্প সেই প্রথম।

পুস্তকাকারে 'ইন্দিরা' প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। আকার ছিল মাত্র ৪৫ পৃষ্ঠা। কিন্তু মৃত্যুর বছরখানেক আগে বঙ্কিমচন্দ্র এই ছোট উপন্যাসখানিকে প্রায় চারগুণ বাড়িয়ে ১৭৭ পৃষ্ঠার একখানি বৃহদাকার উপন্যাসের চেহারা দেন। তাতে কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে বটে, কিন্তু চরিত্র খুব বদলেছে কিনা বলা কঠিন। বর্তমানের পরিভাষায় একে একটি বড় গল্প বলাই হয়তো যুক্তিসংগত।

'ইন্দিরা' অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তার মধ্যে কানাড়ী ভাষায় বি, বেংকটাচার্যের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। ইংরাজীতে Indiraand other stories বইতে জে, ডি, এণ্ডারসন অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে।

"যুগলাঙ্গুরীয়' প্রকাশিত হয় 'ইন্দিরা' প্রকাশিত হওয়ার পরের মাসে, অর্থাৎ ১২৮০ সালের বৈশাখে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে।

'যুগলাঙ্গুরীয়'কেও ছোট গল্পের পর্যায়ে ফেলা যায়। প্রথম সংস্করণে ছিল ৩৬ পৃষ্ঠা, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালের শেষ সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশ। ইংরেজীতে উপন্যাসটির অনেকগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় The Two Rings নামে এর অনুবাদ প্রকাশ করেন তৃত্তৃনস্র খৃষ্টাব্দে। এণ্ডারসনের India and Other Stories-এও এর একটি অনুবাদ আছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। পি, এন, বসু ও ঘোরানে Yugalanguria নাম দিয়ে একটি অনুবাদ করেন। The Two Rings and other stories নামে আরেক অনুবাদ করেন ডি, সি, রায়।

'যুগলাঙ্গুরীয়ের হিন্দী অনুবাদ করেন কে· আর· ভাট। বইখানি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পাটনা থেকে প্রকাশিত হয়।

'চন্দ্রশেখর' বঙ্গদর্শনেই ১২৮০-৮১ সালে চৌদ্দ মাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। এই উপন্যাসটি রোমান্স জাতীয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণের ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় এবিষয়ে বলেছেন,

"উপন্যাসে ঐতিহাসিক ও অলৌকিক বিষয় সন্নিবেশের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল; 'বিষবৃক্ষ' এবং 'ইন্দিরা' লিখিয়া তাঁহার রোমান্সপ্রবণ মন যেন একটু হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাহা ছাড়া বাঙ্গালীর বীরত্ব ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের বাসনা বরাবরই তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। কিন্তু নিজের পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবনের মধ্যে তাহার বিশেষ স্ফূর্তি তিনি দেখিতে পান নাই। সুতরাং তিনি আবার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছিলেন। ইতিহাসের আশ্রয় তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; রামানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ এবং রামচরণ তাঁহারই মানস-পুত্র; ইতিহাসের পটভূমিকায় তাহাদিগকে সজীবতা দিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসেমের সহিত ইংরাজের সংঘর্ষ-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখানে রোমান্স-রচনায় যে অবকাশ তিনি পাইলেন, নিতান্ত সামাজিক পটভূমিকায় প্রতাপ-শৈবলিনীকে লইয়া তিনি ততখানি অগ্রসর হইতে পারিতেন না। আধ্যাত্মিক যোগবলের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশ্বাস ছিল, 'চন্দ্রশেখরে' আমরা সর্বপ্রথম তাহার পরিচয় পাই। তাঁহার সৃষ্ট উপন্যাস-জগতে সর্বপ্রথম আদর্শ-চরিত্র হিসাবে তিনি প্রতাপের অবতারণা করিয়াছেন।"

প্রতাপের চরিত্রের আদর্শপ্রাণতা নিয়ে বহু সমালোচক আলোচনা করেছেন। পরের সুখের জন্যে আত্মত্যাগই প্রতাপ-চরিত্রের মহত্তম গুণ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বলেছেন, "প্রতাপ বরাবর ঐশ্বর্যশালী, কিন্তু ইন্দ্রিয়জয়ী......।" এদিক থেকে, ইন্দ্রিয়জয়ের সাধনাই প্রতাপ-চরিত্রের সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য। বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রতাপের স্থান খুবই উঁচুতে।

ইংরেজীতে 'চন্দ্রশেখরে'র দুটি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯০৪ এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। তামিল ভাষাতেও দুটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তেলেগুতে অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে।

'রাধারাণী' ১২৭২ সালে বঙ্গদর্শনের দুটি সংখ্যায় বের হয়। ১৮৭৭ ও '৮১ খৃষ্টাব্দে আখ্যায়িকাটি 'উপন্যাস—অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ' নামক গ্রন্থের মধ্যে স্থান পায়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আলাদা বই হিসাবে প্রকাশিত হয় এই উপন্যাস-খানি, পৃষ্ঠা সংখ্যা তখন ছিল আটত্রিশ। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়াল পঁচাত্তর। "চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপনে" বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, "এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া, ইহার কলেবর বাড়াইতে হইয়াছে। কাজেই মূল্যও বাড়াইতে হইয়াছে।"

উপন্যাসখানির উৎপত্তি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র অনুমান করেন, একবার তাদের গৃহবিগ্রহ রাধাবল্লভজীউর রথযাত্রার সময় একটি বালিকা মেলায় হারিয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তার আত্মীয়স্বজনের জন্যে নিজেও খোঁজ নিয়েছিলেন। সেই ঘটনা থেকেই রাধারাণীর কাহিনী তাঁর মাথায় আসে।

ইংরাজীতে রাধারাণীর দুখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

'রজনী' ও বঙ্গদর্শনেই প্রথম বের হয় (১২৮১-৮২ সালে)। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৪ সালে, অর্থাৎ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। তখন রচনাটির অনেক সংশোধন করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তার কারণ দেখাতে গিয়ে 'রজনী'র বিষয়ে উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন—

"রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্তন করা গিয়াছে যে, ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খন্ড পূর্ববৎ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে।

"প্রথম লর্ড লিটন প্রণীত 'Last Days of Pompeii' নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি 'কাণা ফুলওয়ালী' আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়াছে।

"উপন্যাসের অংশবিশেষ, নায়ক বা নায়িকা বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা, প্রচলিত রচনাপ্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইল্‌কি কলিন্স কৃত 'Woman in White' নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত

করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয় নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সংক্ষেপে 'রজনী' বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য প্রায় সবই বলে দিয়েছেন। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস রচনার দিকে 'রজনী' একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। নায়ক-নায়িকার কথা তাদের মুখেই ব্যক্ত করার এই প্রণালী পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তার 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে ব্যবহার করেন।

'রজনী'র গুজরাটী অনুবাদ প্রকাশ করেন এন. হেমচন্দ্র, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে।

(কৃষ্ণকান্তের উইল)

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তাঁর নিজেরও সেই রকম ধারণা ছিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিম-প্রসঙ্গে লিখেছেন, "স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর নিজের মতে সর্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস।"

পারিবারিক বিরোধই যে উপন্যাসখানির বিষয়বস্তুর মূলে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার এক উইলের ফলে তাঁর ও ভাইদের মধ্যে কিছু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ার বাস তুলে দিয়ে চুঁচুড়ায় চলে যান। এর ফলে 'বঙ্গদর্শন'ও কিছুদিন বন্ধ থাকে।

চুঁচুড়ায় থাকার সময়ে একদিন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যে কথাবার্তা হ'য়েছিল, তাতেও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সঙ্গে পারিবারিক বিরোধের সম্পর্ক টের পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন—

"এক বৎসরের পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) খুশী হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি তো চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু কৃষ্ণকান্তী আছে?' তিনি বলিলেন, 'তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমি বড় খুশী হইলাম, তোমার কাছে আমার বিশেষ কৈফিয়ৎ দিতে হইল না।"

১২৮২ সালের শেষের দিকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হ'তে থাকে। তিন সংখ্যায় বের হওয়ার পর বন্ধ হ'য়ে যায়। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশও তার পরের মাসে বন্ধ হ'য়ে যায়। এক বৎসর পর পারিবারিক বিরোধ মিটলে 'বঙ্গদর্শন' আবার বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'তে শুরু করে। সেই সংখ্যা থেকে (১২৮৪ সালের বৈশাখ) কৃষ্ণকান্তের উইলও বের হ'তে থাকে।

দ্বিতীয়বারে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' দশম পরিচ্ছেদ থেকে শুরু হয়। এই পরিচ্ছেদ আরম্ভ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র পাদটীকায় লিখেছিলেন, "বঙ্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ডের ৪০৯, ৪৫১, ৫৬১ পৃষ্ঠা দেখ। দশম পরিচ্ছেদ পড়িবার পূর্বে প্রথম নবম পরিচ্ছেদ আর একবার পড়িলে হয় না!"

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসখানির অন্যতম প্রধান দুই চরিত্র রোহিণী এবং গোবিন্দলালের অনেক পরিবর্তন করেন।

রোহিণী প্রথমে অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির দুশ্চরিত্রা নারী ছিল। তার কথাবার্তা ধরণধারণ সবই ছিল নিতান্ত কুলটা মেয়ের মতো। পরে তিনি এ চরিত্র বদলিয়ে বিধবা রোহিণীকে হরলালের প্রেম ও পানিপ্রার্থিনী ক'রে উপস্থিত করেন। নিছক অর্থের লালসায় সে উইল চুরি করতে রাজি হয়নি, হরলাল তাকে বিবাহ করতে রাজি, এই ছিল তার দুষ্কর্মের সাফাই। এতে রোহিণীকে অনেক রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয়। তারপর গোবিন্দলালের প্রতি তার আসক্তি এবং চারিত্রিক পতন অনেক মানবিক হ'য়ে দেখা দিয়েছে—তাকে নিছক পাপিষ্ঠা বলে আর পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই যে তাঁর রচনার কতো বড় সমালোচক ছিলেন, এই রোহিণী চরিত্রের পুনর্গঠন তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গোবিন্দলালের চরিত্রেও তিনি শেষ পরিণতিতে পরিবর্তন ঘটান। প্রথমের দিকের সংস্করণে গোবিন্দলাল আত্মহত্যা করে মনের জ্বালা শান্ত করতে চেয়েছিল। শেষের দিকে সে প্রায়শ্চিত্ত এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে শান্তি পায়।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলালের অধঃপাতের আগে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য প্রকাশ করে লিখেছিলেন—

"গোবিন্দলালের প্রধান ভ্রম যাহা, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস, সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্য, তাঁহার আপনার জন্য নহে। ধর্ম পরের সুখের জন্য, আপনার চিত্তের নির্মলতা সাধন জন্য নহে, ধর্মাচরণ ধর্মের জন্য নহে, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যে পবিত্রতার জন্য পবিত্র হইতে চাহে না, অন্য কোনও কারণে পবিত্র, সে বস্তুতঃ পবিত্র নহে। তাহাতে এবং পাপিষ্ঠে বড় অধিক তফাৎ নাই। এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের অধঃপতন হইল।

রোহিনীর অপমৃত্যুর বিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে একটি টিপ্পনী প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন—

"অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির হওয়ার পরে, অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'রোহিণীকে মারিলেন কেন?' অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, 'আমার ঘাট হইয়াছে।' কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাসপাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।

রোহিণীর হত্যা বিষয়ে পরবর্তী কালেও অনেক সমালোচনা হ'য়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন, তা একদিক থেকে ঠিকই মনে হয়। রোহিণী-চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তা পার্শ্বচরিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই তাকে বাঁচিয়ে রেখে ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের কাছে সে অপ্রয়োজনীয় এবং বাধাস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে এটা দেখানোর মতো স্থান এ উপন্যাসে ছিল না।

প্রধান চরিত্র ভ্রমর এবং গোবিন্দলাল। এই দুই চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন, দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর মর্যাদা কতখানি হ'তে পারে। বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী স্বামীকে সুখী করার জন্যে তার বিবাহ দিয়ে গৃহত্যাগী হ'য়েছিল। কিন্তু ভ্রমর যখন দেখল তার স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত তখন সে নিজে পিতৃগৃহে চলে গেল। এতে তার শুধু অভিমানই প্রকাশ পায়নি, আত্মমর্যাদা বোধও প্রমাণিত

হ'য়েছে। ভ্রমর অত্যন্ত কোমল স্বভাবের মেয়ে হ'লেও সমাজে নারীপুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার এই আত্মত্যাগ বঙ্কিম সাহিত্যে উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে।

কৃষ্ণকান্তের উইলের ভাষাও অত্যন্ত আশ্চর্যরকম সহজ ও অনাড়ম্বর। ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্রসৃষ্টি ও লিখন কৌশলে এই উপন্যাসখানি শুধু বঙ্কিমসাহিত্যেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ইংরেজী অনুবাদ হ'য়েছে দুটি। প্রকাশিত হ'য়েছে ১৮৯৫ ও ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ। তাছাড়া হিন্দী, তেলেগু ও কানাড়ী ভাষাতেও অনুদিত হয়েছে উপন্যাসখানি।

(রাজসিংহ)

'রাজসিংহ' বঙ্কিমচন্দ্রের একাদশ উপন্যাস। প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর যে আকারে ছিল, চতুর্থ সংস্করণে (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) মৃত্যুর কিছু আগে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের এত পরিবর্তন করেন যে প্রায় নতুন উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায়। তখন আকারও বেড়ে যায় পাঁচ গুণ, এবং বলতে গেলে এইটিই হ'য়ে ওঠে তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই 'রাজসিংহ'কে তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। বঙ্গদর্শনে কিছুকাল ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'য়ে বন্ধ হ'য়ে যায় উপন্যাসখানি। তখনো অসমাপ্ত ছিল। সম্পূর্ণ ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতেও দেরী করেন বঙ্কিমচন্দ্র। কারণ সম্পর্কে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বঙ্কিমপ্রসঙ্গে বলেছেন—

"রাজসিংহ" তাহার কিছুদিন আগে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রশেখরবাবু ('উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' রচয়িতা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ হইতেছে না কেন? বঙ্কিমবাবু তাঁহার কোনও বন্ধুর নাম করিয়া বলিলেন, 'এ'রা বলেন—আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলেপুলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মানিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না"......চন্দ্রশেখরবাবুতে এবং আমাতে এক-যোগে বলিলাম, মানিকলালের মত দুই একটা ডাকাতের চিত্র দেশের সম্মুখে ধরিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। এই কথায় বঙ্কিমবাবু কি ভাবিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার অল্পদিন পরে 'রাজসিংহে'র প্রথম সংস্করণ বাহির হইল।"

কিন্তু এই প্রথম সংস্করণে রাজসিংহের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮৩, চতুর্থ সংস্করণে তা দাঁড়ায় ৪৩৪ পৃষ্ঠায়।

'রাজসিংহে'র দীর্ঘ বিজ্ঞাপন বা ভূমিকায় এই উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য এবং উপাদানের বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করা গেল—

......"মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান কথা, হিন্দুদিগের সঙ্গে মোগলের বিবাদ। মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুগণের মধ্যে প্রধান রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়। ...রাজপুত-গণের বীর্য অধিকতর হইলেও, এদেশে তেমন সুপরিচিত নহে। তাহা সুপরিচিত করিবার যথার্থ উপায় ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস লিখিবার পক্ষে অনেক বিঘ্ন।

প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। ......অন্তত এ কার্য বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ।

"হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।...

"যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।

"স্থূল ঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে প্রায় তেমনই রাখিয়াছি।...তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, উদিপুরী, ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।

......"পরিশেষে বক্তব্য যে, আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।"

কিন্তু অন্যে পেরে না থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র যে পেরেছেন তাও বলা বাহুল্য। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার চেয়ে ভালোভাবে বলা অসম্ভব। তিনি লিখেছেন—

"তাহার এক একটি খণ্ড এক একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিমিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি—তাহার পর ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি, কতক বা নদীর স্রোত, কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন, কতক বা তীব্র নয়নাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা কালপুরুষ লিখিত ইতিহাসের বিরাট ব্যাকুল বিস্তার, কতক বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

(আনন্দমঠ)

শেষজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম রচনা ক'রে তাঁর সমাজতত্ত্বমূলক ধারণাগুলিকে বাণীমূর্তি দেন। তিনি কোঁৎ-এর পজিটিভিজম্-এর প্রভাবিত হচ্ছিলেন। বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলই এই 'সমষ্টিবাদে'র মূল কথা। এই সমষ্টিবাদের প্রসারের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'অনুশীলনতত্ত্ব' (culture)-এর অবতারণা করেন। 'আনন্দমঠ' 'অনুশীলন তত্ত্বে'র প্রথম উপন্যাসরূপ। এখানে সমষ্টির উপর তার ক্রিয়া কী রকম হ'তে পারে তাই দেখানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

সেদিক থেকে উদ্দেশ্যমূলক হ'লেও বাংলার এবং ভারতের জাতীয় জীবনের সংগঠনে 'আনন্দমঠে'র গভীর প্রভাবের কথা মনে রাখলে এই উপন্যাসখানিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা বলতে হয়। পূর্বে আলোচিত 'বন্দেমাতরম্' গান এই উপন্যাসেরই অংগ। ফলে স্বদেশকর্মীদের কাছে 'আনন্দমঠ' গীতার মতোই পবিত্র হ'য়ে ওঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে এদেশে জাতীয়তা বোধের প্রথম স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। সিভিল সার্ভিস, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন, অস্ত্র আইন ইত্যাদির ফলে বাংলা দেশে যে আন্দোলন শুরু হয় তা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতা তখন দেশের রাজধানী। কাজেই এখানেই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু সারা ভারতই ছিল তার পটভূমি।

এই নবজাত দেশাত্মবোধ ঠিক পথে পরিচালিত করা তখন ছিল যুগের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কারণ আন্দোলন কোন পথে যাবে, ইংরাজের সংগে আমাদের সম্বন্ধ কী দাঁড়াবে, তার উপর সমস্ত দেশের ভাগ্য নির্ভর করছিল তখন।

'আনন্দমঠ' রচনা ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র জানালেন, ইংরেজ প্রভুত্ব গ্লানিকর হ'লেও দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যে তা তখনকার মতো সহ্য করাই সুবুদ্ধির কাজ। এর ফলে দেশে অরাজকতা গিয়ে সুস্থ সামাজিক জীবন সৃষ্টি হবে, ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে আমরা বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হব, এবং একদিন ইংরেজের সমকক্ষ হ'য়ে শাসন-পাশও কাটাতে পারব। দেশের প্রকৃত মংগল যে এই দিকেই তা তিনি ভালভাবেই হৃদয়ংগম করেছিলেন। 'আনন্দমঠে'র মারফৎ দেশবাসীকেও জানিয়ে ছিলেন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য যাই হোক, ফল হল অন্যরকম। উপন্যাসের 'সন্তান'-দলের নিষ্কাম স্বদেশ প্রেম, এবং আত্মত্যাগের আদর্শ, বন্দেমাতরম্ সংগীতের মন্ত্রের মতো প্রভাব, আর সর্বোপরি সমস্ত রচনাটির গভীর ভাবব্যঞ্জনা বাঙালী তরুণদের হৃদয়ে আশ্চর্য স্বদেশভক্তি ও সেবাধর্মের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। বাংলার জাতীয় জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে 'আনন্দমঠে'র স্থান অদ্বিতীয় এবং অবিস্মরণীয়।

বঙ্কিমচন্দের ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন, তাঁরা কয়ভাই তাদের মেজঠাকুরদার কাছে বাল্যকালে প্রায়ই গল্প শুনতেন। তিনি প্রায় একশ বছর জীবিত ছিলেন। গল্প বলার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। মাঝে মাঝে তিনি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিষয়েও গল্প বলতেন। পূর্ণচন্দ্র অনুমান করেন,—

"এই গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অগ্রজের উহা মনে ছিল, কেননা ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সময়ে ঐ গল্পটি আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার মনে হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোন উপন্যাস লিখিবার তাঁহার অনেক দিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই, কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে 'আনন্দমঠ' লিখিলেন। 'বন্দেমাতরম্' গীতটি উহার বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল।"

'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায়' রমেশচন্দ্র দত্ত 'আনন্দমঠ' বিষয়েও এই কথা লিখেছেন,—

"Of all his works, however, by far the most important from its astonishing political consequences was the

'Ananda Math' which was published in 1882 about the time of the agitation arising out of the Ilbert Bill...... But though the 'Ananda Math' is in form an apology for the loyal acceptance of British rule, it is none the less inspired by the ideal of the restoration, sooner, or later, of a Hindu Kingdom in India. This is especially evident in the occasional verses in the book, of which the 'Bande Mataram' is the most famous."

'বন্দেমাতরম' গানটির ভবিষ্যতের বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। মৃত্যুর দু'-চার বছর আছে, তিনি তাঁর জেষ্ঠ্যা কন্যাকে বলেন, "একদিন দেখিবে—বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, এই গান লইয়া বাঙ্গলা উন্মত্ত হইয়াছে—বাঙ্গালী মাতিয়াছে।"

তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী সার্থক হয়েছিল। এবং তার ধাক্কা ইংলন্ড পর্যন্ত পেঁছে-ছিল। এই সঙ্গীতটি নিয়ে সেখানে অনেক আলোচনা হয়, এবং 'ব্রিটানিকা' এই সিন্ধান্তে আসে—

"The poem then, is the work of Hindu idealist who personified Bengal under the form of a purified and spiritualised Kali........Lines 10, 11 and 12 are capable of very dangerous meanings in the mouths of unscrupulous agitators."

'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের উপাদান ব্যবহার করলেও এখানি যে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় তা নিজেই ব'লে গেছেন। পরবর্তী উপন্যাস দেবীচৌধুরাণীর 'বিজ্ঞাপনে' তিনি লেখেন—

" 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইলে অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। সন্ন্যাসিবিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। ....ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। ....

তারপর তিনি সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য বিভিন্ন প্রামাণিক ইংরাজী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ক'রে প্রকৃত ইতিহাস কী, তা জানান। প্রকৃত ঘটনা জানার পর বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একমত হ'তে হয়, "ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল।"

এবং এই বিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা 'আনন্দমঠে'র প্রভাবেও যে পরবর্তী কালে ব্যাপার বড় গুরুতর হ'য়েছিল তা আমরা আগেই দেখেছি।

দেশী ও বিদেশী বহু ভাষায় 'আনন্দমঠে'র অনুবাদ প্রকাশিত হ'য়েছে। ইংরেজী অনুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। নাম Abbey of Bliss. হিন্দী মারাঠী, তামিল, তেলেগু ও কানাড়ী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে উপন্যাসখানি। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের অনুবাদ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

(দেবীচৌধুরাণী)

'অনুশীলনতত্ত্ব'কে সমষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেমন আনন্দমঠের উদ্দেশ্যে, সেই তত্ত্বকে ব্যষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা 'দেবী চৌধুরাণী'র মূল প্রেরণা। 'দবী চৌধুরাণী'র 'মটো' (motto) কী, তা বইয়ের শুরুতে এই উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্টঃ "The substance of Religious Culture." স্বামীপরিত্যক্তা প্রফুল্লকে যোগ্য গুরুর তত্ত্বাবধানে নিয়ত আত্মানুশীলনে নিষ্কাম ধর্মপালনের আদর্শ পাত্রী হিসাবে গড়ে তোলাই বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের আশ্রয় নেন। কিন্তু তিনি এই উপন্যাসকে ঐতিহাসিক বলে দাবি করেন নি। তিনি 'বিজ্ঞাপনে' লেখেন,—

"দেবী চৌধুরাণীরও (আনন্দমঠের মতো) ঐরূপ একটু ঐতিহাসিক মূল আছে। ......সে কথাটা বড় বেশী নয়, এবং 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুডল্যান্ড সাহেব, লেফ্‌টেনান্ট ব্রেনান, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ, সেনা, প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই পর্যন্ত। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ-পূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।

'দেবী চৌধুরাণী'র বিষয়ে পরবর্তীকালে অনেক সমালোচক আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, ললিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সমালোচকের নাম উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এই উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু প্রকাশ করেন নি। পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ মাত্র পাওয়া গেছে। পরে ১৮৯৩ ও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এর দুটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হ'য়েছে। তাছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও উপন্যাসখানির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে—তার মধ্যে তামিল, তেলেগু ও কানাড়ী অনুবাদও আছে।

(সীতারাম)

'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। 'অনুশীলনতত্ত্ব' প্রচার এ উপন্যাসেরও মূল উদ্দেশ্য ছিল। এখানে ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির অর্থাৎ ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বোঝানোই আসল লক্ষ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন—

"সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।" ....

সীতারাম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে। তার আগেই 'বঙ্গ-দর্শন' উঠে গিয়েছিল। 'প্রচার' নামক পত্রিকা হ'য়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রকাশের বাহন। ঐ পত্রিকাতেই সীতারাম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় প্রথমে।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে 'সীতারামে'র ঐতিহাসিকতা বিষয়ে কোন দাবি না রাখলেও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ ইতিহাসবেত্তাগণ উপন্যাসখানির এদিক থেকে আলোচনা করেছেন। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন—

"এই গ্রন্থখানি ইউরোপীয় সাহিত্যে রচিত হইলে সেখানকার গুণিগণ ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেণীতে নিঃসন্দেহে স্থান দিতেন।"

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সীতারামের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাছারা উপন্যাসখানির তামিল ও কানাড়ী অনুবাদও আছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ উপন্যাসখানির নাট্যরূপ প্রকাশ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে তাঁর লেখকসত্তার আশ্চর্য ক্রমাভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকে, অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনীতে তিনি মানুষের স্বাভাবিক ভোগাধিকার অর্জনের দিকে উদ্বুদ্ধ করলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে সামাজিক উপন্যাসগুলিতে তিনি এই ভোগাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে, ভিতরে ও বাহিরে কত বাধা, তা দেখান। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণকান্তের উইল এই পর্যায়ের রচনা। শেষের তিনখানি উপন্যাসে কীভাবে অনুশীলনের দ্বারা মানুষ সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, এবং অনুশীলনের অভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কী বিষম বিপর্যয় ডেকে আনে, তাই দেখিয়েছেন। সেদিক থেকে গীতার প্রভাব এই তিনখানি উপন্যাসে অত্যন্ত বেশি। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে নিষ্কাম কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ করা।

তাঁর সাহিত্য-কীর্তিকে ভালো করে অনুধাবন ক'রে তাই আমরা তাঁকে শুধু উচ্চাঙ্গের রসস্রষ্টা বলেই ক্ষান্ত হ'তে পারিনা, মহান্ সত্যদ্রষ্টা হিসাবেও সম্মান জানাতে বাধ্য। বাংলা সাহিত্যে এবং বাংলার জাতীয় জীবনে সেই জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এত গভীর এবং চিরস্থায়ী।

৭। অন্যান্য গদ্যরচনা
(ব্যঙ্গরচনা—প্রবন্ধাবলী—ধর্মতত্ত্ব)

উপন্যাস ছাড়াও বহু বিষয়ে গদ্যরচনা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে উপহার পেয়েছেন বাংগালী পাঠক। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার কলেবর পূর্তির জন্যে অজস্র গদ্য লিখতে হ'য়েছে তাঁকে। পরবর্তীকালেও নিজের তাগিদে অনেক কিছু লিখেছেন তিনি।

তাঁর এ ধরণের রচনার মধ্যে 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', 'বিবিধ প্রবন্ধ' (দুই খণ্ড), 'কৃষ্ণচরিত', 'ধর্মতত্ত্ব' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'লোকরহস্য' ব্যঙ্গকৌতুকপূর্ণ রচনা। এগুলির বিষয়বস্তু আমাদের সামাজিক জীবন এবং মানবচরিত্রের হাস্যকর দিক। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "এ গ্রন্থে শ্রেণীবিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।" পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে।

'কমলাকান্ত' গ্রন্থের তিনটি ভাগ আছে—কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র এবং কমলাকান্তের জবানবন্দী। লোকরহস্য বঙ্কিমচন্দ্রের রহস্যপ্রিয় সমাজসমালোচক-পূর্ণ স্ফূর্তির সুযোগ পায় নি। তাছাড়া একই ধরণের রচনায় 'বঙ্গদর্শনের পাঠকগণ ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে এ আশঙ্কাও তাঁর মনে ছিল। তাই তিনি এক আফিংখোরের চরিত্র—কমলাকান্তের আবির্ভাব ঘটালেন বাংলা সাহিত্যে। সোজা ভাষায়, প্রবন্ধের মতো করে যা বললে কড়া বা নীরস লাগতে পারে, নেশাখোর কমলাকান্তের মুখে সে সব অতি সহজেই মানিয়ে যেতে লাগল। কমলাকান্তকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি সব বিষয়েই ঈষৎ ব্যঙ্গের সঙ্গে তাঁর মতামত প্রকাশ ক'রে গেছেন। এই গ্রন্থের "আমার দুর্গোৎসব" রচনাতেই তিনি দেশকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করেছেন—বন্দেমাতরম্ সংগীতে সেই কল্পনা পরিণত রূপ পায়।

অনেকে 'কমলাকান্ত'কে ডি কুইন্সীর Confessions of an Opium Eater-এর অনুকরণ বলেছেন। কিন্তু নিকট বিচারে মিল খুবই কম মনে হয়। অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের সঙ্গে একমত হ'য়ে আমরা বলতে পারি, "উহাতে কমলাকান্তের মৌলিকতার হানি হয় না।"

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় চার বছর পরে। তখনকার সমাজে তো বটেই এখনো সমাজে অনেক মুচিরামের দেখা পাওয়া যায়। অন্তঃসারশূন্য, খোশামোদকারী এবং বিবেকবর্জিত এরকম ভাগ্যান্বেষী সমাজের কলঙ্ক। বঙ্কিমচন্দ্র কঠিন বিদ্রূপের সাহায্যে এদিকে কতকাল আগেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এতে তাঁর গভীর সামাজিক চেতনাই প্রমাণিত হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থে এ বিষয়ে লিখেছেন—"রাজপদে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি সৌভাগ্যবলে অনুচিত সম্মান লাভ করে বটে এবং হয়ত যোগ্যতর অনেক ব্যক্তিও নানা ঘটনাচক্রে উপযুক্তরূপ সম্মান ও পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েন না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জীবনে সরকারের নিকট হইতে কখনও অনাদর পান নাই। এমত

অবস্থায় মুচিরামের সৃষ্টি কেন এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠিতে পারে। তিনি নিজ সার্বিসে এবং হয়ত নিজ ষ্টেশনেই নিজের পার্শ্বে অনেক মুচিরাম, ঘটিরাম দেখিয়া ছিলেন। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ও তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরকারে প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছিল। মুচিরামে বঙ্কিম পাঠকগণকে সেই হাস্যরসের ভাগ দিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে হাস্যের সঙ্গে যে বিদ্রূপের বিষজ্বালা মিশ্রিত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। যাহা নিন্দার্হ ও উপহাসযোগ্য বঙ্কিম তাহারই নিন্দা ও উপহাস করিয়াছেন। মুচিরাম-ঘটিরাম ইত্যাদির সৃষ্টি এক হিসাবে প্রকৃষ্ট সমাজসেবা......।"

বাস্তবিক 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্ময়কর রচনা।

'বিবিধপ্রবন্ধ' (১ম ও ২য় ভাগ) গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃত-কাব্য, বাংলসাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংগীত, রাজনীতি, লোকশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে যতো প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে' বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন, সেইগুলির নির্বাচিত রচনা স্থান দিয়েছেন। এই দুইখন্ড বইয়ের কথা বলতে গেলে তাই 'বঙ্গদর্শনে'র কথাই বিশেষ করে বলতে হয়।

'বঙ্গদর্শন' সে যুগে বাংলাসাহিত্যে নবযুগ এনেছিল। বাংলা দেশের পাঠক-বর্গের রুচিগঠনে 'বঙ্গদর্শনে'র যত ব্যাপক অবদান এমন আর কোনো পত্রিকার ছিল না, পরেও হয়নি। আর বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন 'বঙ্গদর্শনে'র মধ্যমণি। একজন লেখক, যিনি প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যস্রষ্টা, তিনি এত বিভিন্ন বিষয়ে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে লিখতেন কী করে, তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের নাম বাদ দিলে বাংলা-সাহিত্যে এমন সর্বশক্তিমান লেখক আর কেউই ছিলেন না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গেছেন,

"তখন বঙ্গসাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত, আমাদের সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।......

"পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তে অনুভব করিতে পারিলাম। ......'বঙ্গদর্শন' যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগতো রাজবদুন্ধতদ্যুতি, এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আসন্নবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। ......বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।......

"......বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য কি বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি ধর্মগ্রন্থ যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা যেখানেই তাঁহাকে আর্তস্বরে আহবান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দেখা দিয়াছেন।"

বিপন্ন বঙ্গভাষার আর্ত আহবানেই 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব। এবং 'বঙ্গদর্শনে'র

উপযোগিতা প্রমাণ করার তাগিদে সৃষ্টি হয় 'বিবিধ প্রবন্ধে'র রচনাগুলি। বিভিন্ন বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত এখনো শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনার যোগ্য। বহু বিষয়ে পথিকৃৎ, অনেক বিষয়ে তিনি যা বলেছেন, এখনো তাই শেষ কথা।

'বঙ্গদর্শন' উঠে যাওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র 'নবজীবন' ও 'প্রচার' নামক দুটি পত্রিকায় হিন্দুধর্ম বিষয়ে তিনটি প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। ইউরোপীয় দর্শন ও সমাজতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তাঁর মন ক্রমে হিন্দু দর্শন ও ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রবন্ধ তিনটি তারই ফলস্বরূপ। এর মধ্যে একটি অনুশীলনধর্ম বিষয়ে এবং অন্য দুটির বিষয়বস্তু দেবতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র।

'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথমে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তখন ঐ বই অসম্পূর্ণ ছিল। পরে সম্পূর্ণ বই ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বইয়ের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বে প্রকাশিত মতের যে পরিবর্তন হ'য়েছে তা স্বীকার করেন। এবং বলেন,—

"এরূপ মত পরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণ বিষয়েই আমার মত পরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবন্ধ হইয়াছে।...... মত পরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল।"

কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তার অনুশীলনতত্ত্বের গভীর যোগ আছে, তাও বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলে গেছেন। কৃষ্ণকে তিনি আদর্শ পুরুষ হিসাবে দেখেছেন। তাঁর মতে—

"........অনুশীলন ধর্মে, যাহা তত্ত্বমাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ।........ কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।"

'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র যে কী গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তার 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে নিজে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রে তিনি তা বলেন নি। তিনি লিখেছেন, "কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য।" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, সে কাজে তিনি বহুল পরিমাণে সার্থক হ'য়েছেন। কারণ, 'কৃষ্ণের বৃত্তান্ত' যে প্রাচীনতম গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যায়, সেই "মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন" করতে পেরেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এতে তাঁর 'প্রত্নতাত্ত্বিক জ্ঞানের' গভীরতা দেখে বিস্মিত হ'তে হয়।

'ধর্মতত্ত্ব' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে। হীরেন্দ্রনাথ বলেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব'।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'ধর্মতত্ত্বে'র বিষয়বস্তু এই ক'টি—

"১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার নাম বৃত্তি দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।"

এর পর আর ব্যাখ্যা করার দরকার হয় না।

৮। শেষজীবন ও মৃত্যু

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে চাকরি থেকে অবসর নেন। তিনি ভেবেছিলেন, এইবার তিনি পুরোপুরি সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করবেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছামতো কাজ করা সম্ভব হয়নি।

এর পর তিন বছর তিনি জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে নতুন কিছু লিখে উঠতে পারেন নি তিনি। একখানি সামাজিক উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন বটে কিন্তু শেষ ক'রে যেতে পারেন নি।

তবে পুরনো লেখার অনেক পরিমার্জনা ও পরিবর্ধন করেছিলেন তিনি এই সময়ে। 'ইন্দিরা' 'রাজসিংহের' বর্তমান বর্ধিত আকার তিনি এই সময়েই দেন। তাছাড়া আনন্দমঠ, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয়, কৃষ্ণচরিত্র ও কৃষ্ণকান্তের উইলেরও নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। 'ঢেঁকি' নামক একটি নতুন প্রবন্ধ 'কমলাকান্তে' সংযোজিত করেছিলেন।

তাছাড়া তাঁর কবিতা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ গদ্যপদ্য নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন তিনি এই সময়ে। 'বিবিধ-প্রবন্ধের'ও নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন।

অবসর নেওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতাতেই বাস করতে শুরু করেন। তাঁর বাড়ি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের নিত্য মিলনক্ষেত্র হ'য়ে উঠেছিল। কত লোক যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তার ঠিক নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ মিশুকে লোক ছিলেন না। কিন্তু ভদ্রতা ও সৌজন্য ছিল তাঁর অসাধারণ।

এই সময় তিনি একটি সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। তখন তার নাম ছিল Society for the higher training of young men, এখন নাম হ'য়েছে University Institute। এই সমিতির সভায় বঙ্কিমচন্দ্র ছ'টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার মধ্যে দুটি সভা মাত্র ইনস্টিটিউট-এর হলে বসেছিল বাকী চারটি বক্তৃতা তিনি নিজের বাড়িতেই দিয়েছিলেন।

ইনস্টিটিউটের বাড়িতে যে দুটি বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন, তার বিষয়বস্তু ছিল উপনিষদ। সেগুলি University Magazine-এ প্রকাশিত হ'য়েছিল। বাকী চারটি বক্তৃতা ছিল শরীর সম্বন্ধে। এগুলির কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

ইনস্টিটিউট ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটেরও সদস্য ছিলেন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ থেকে। কিন্তু মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ পদ অধিকার করে থাকলেও তিনি সিনেটের সভায় বড় বেশি যেতেন না। যখন যেতেন, স্বাধীনভাবে নিজের মত ব্যক্ত করতেন। কোনো দলে মিশতেন না।

শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরবিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছিলেন। গীতাপাঠ তাঁর নিত্যকর্মের মধ্যে গণ্য হ'য়েছিল। আগে কিন্তু তিনি ঈশ্বর বিষয়ে বিশেষ উৎসাহিত ছিলেন না। বরং নাস্তিকই ছিলেন বলা যায়। তিনি যখন বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সে সময়ের কথা স্থানীয় এক ব্যক্তি যা লিখেছেন তাতে সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতিগতি কেমন ছিল তা বোঝা যায়। লেখক জানাচ্ছেন—

"এই সমস্ত পরীক্ষার সময় (অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে) আমি কখনও তাঁহার

মধ্যে ঈশ্বর ভক্তির অপার উচ্ছ্বাস দেখি নাই—কখনও ঈশ্বরের নামগুণ শুনি নাই. বা ঈশ্বর বিশ্বাসের কোন পরিচয় পাই নাই।"

এর পর পত্রলেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু পরিচয় দিয়ে লিখেছেন,—

"বঙ্কিমবাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বর-বিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত। আমি থিওডোর পার্কারের Ten Sermons নামক পুস্তকখানি তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন, এবং সপ্তাহান্তে তাহা আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, such worst English I have never read।"

সে হল ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের কথা। জীবনের পঞ্চাশ বছর পার না হতেই তাঁর ধারণা গেল বদলে। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মে আত্মার আশ্রয় খুঁজে পেলেন। তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্দ্রকে তিনি একদিন বলেছিলেন,—

"আমার জীবনে অনেক ভ্রমপ্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন।...... আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে লোকে ভাবিবে কি যে কি এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি অতি আশ্চর্য রকমে পরিবর্তিত হইয়াছিল। কেমন করিয়া তাহা হইল, জানিলে লোকে আশ্চর্য হইবে।......"

তাঁর শেষ জীবনের রচনাগুলি তাঁর এই স্বধর্মপ্রীতির জ্বলন্ত নিদর্শণ। গীতার ব্যাখ্যা, কৃষ্ণচরিত্র, সীতারাম সবই সেই এক লক্ষ্যে নিযুক্ত। কিন্তু দুটি জিনিস বিশেষভাবে চিন্তা করার মতো। তিনি ধর্ম বা ঈশ্বর নিয়ে অযথা আড়ম্বর করেন নি। এবং যা তিনি বলেছেন তা যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অন্ধ কুসংস্কার বা যুক্তিহীন আত্মসমর্পণ তাঁর মধ্যে কখনোই লক্ষ্য করা যায়নি। 'কৃষ্ণচরিত্র' এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কৃষ্ণের বাল্যলীলায় অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিবাদী ছিলেন বলে এই অংশটিকে তিনি প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। সেকালের হিসাবে এ একটা দুঃসাহস ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু তিনি যা বিশ্বাস করতেন অকপটে তা প্রকাশ করতে ভয় পেতেন না। পরবর্তী কালে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত দেখিয়েছেন, তাঁর বিশ্বাসও কতদূর যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিশ্বাস এবং যুক্তির কথায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আরো অনেক কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। যেমন সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বখ্‌তিয়ার খিলজী বাংলাদেশ জয় করেছিল তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে শীর্ণদেহ রুগ্ন বাঙ্গালীকে দেখা গেছে, বাঙ্গালী নিশ্চয়ই সেরকম চিরকাল ছিল না। এসব বিদেশী শাসনের ফল। বাঙ্গালী যখন স্বাধীন জাতি ছিল তখন তারা সবলকায় যোদ্ধা জাতিই ছিল। না হলে তারা রাজ্যজয় এবং রাজ্যস্থাপন করতে পারত না। এ রকম একটা জাতিকে মাত্র আঠারজন সৈনিক পরাজিত করে ফেলল, তা অবিশ্বাস্য।

পরবর্তীকালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ও যুক্তি ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

তারপর সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আসক্তির কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক

উপন্যাসেই সন্ন্যাসী বা ঐ ধরণের কোনো অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন চরিত্রের অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন এই সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। শ্রীশচন্দ্র লিখছেন—

"কথায় কথায় আমি তাঁহার নভেলসমূহে সন্ন্যাসী চরিত্রগুলির কথা তুলিলাম। (বঙ্কিমচন্দ্র) হাসিয়া বলিলেন, 'সব নবেলেই আছে বটে, কিন্তু কেন থাকে জানি না।'

"আমি বলিলাম, "আপনার পিতার সম্বন্ধে সন্ন্যাসীর গল্প সঞ্জীববাবুর কাছে শুনিয়াছি। হইতে পারে তার দরুণ শৈশবাবধি মনে একটা impression আছে!"

"বঙ্কিমবাবু। সে গল্প শুনিয়াছি বটে, কিন্তু সে জন্য কিছু হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। তবে অনেক স্থানে অনেক সন্ন্যাসী দেখিয়াছি।

"আমি। বইয়ের অনুরূপ কোন সন্ন্যাসীর আশ্চর্য কীর্তিকলাপ কখন দেখিয়াছেন কি?

"বঙ্কিমবাবু একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, 'না'।"

উপন্যাসের প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখেছেন, ব্যক্তিগত কথাবার্তায় তার সত্যত স্বীকার করতে তাঁর আপত্তি ছিল। কারণ, উপন্যাসে সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির কথা থাকলেও, সেইটেই প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। মূল কাহিনী বা চরিত্রের উন্মেষে সাহায্যের জন্যেই ঐ চরিত্রগুলির আবির্ভাব। ব্যক্তিগত জীবনে তাকে মেনে নেওয়ার অর্থ নির্বিচার কুসংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ। বঙ্কিমচন্দ্র কখনো তা করেন নি।

চাকরী-জীবনেই বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমূত্র রোগের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু তিনি তার জন্যে খুব একটা অসুবিধা ভোগ করেন নি। চিকিৎসা না করানো সত্ত্বেও রোগ তেমন বাড়তে পারেনি।

বাংলা ১৩০০ সালের শীতকালে অসুখটা হঠাৎ খুব বেড়ে উঠল।। রাত্রির ঘুম কমে এল এবং অন্যান্য উপসর্গও প্রবল আকার ধারণ করল। শেষে চিকিৎসার প্রস্তাব হল। বঙ্কিমচন্দ্র রাজি হলেন।

কিন্তু চিকিৎসায় রোগের উপশম হল না। বরং বেড়ে যেতে লাগল। চৈত্র মাসে তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন।

এই রোগে অনেক সময়ই ফোঁড়া ইত্যাদি দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রেরও তাই হল। অস্ত্র চিকিৎসক ও'ব্রায়েন সাহেব এসে ফোঁড়া দেখে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিলেন। অন্যান্য চিকিৎসকও তাঁর সঙ্গে একমত হলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ভীষণভাবে আপত্তি জানালেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল এবার আর তিনি সেরে উঠবেন না। শুধু শুধু শারীরিক যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে লাভ কি?

পরদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এসে তাঁকে পরীক্ষা ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রের মতেই মত দিলেন। অস্ত্রোপচার হল না। কিন্তু ফোঁড়াটা দু' একদিনের মধ্যেই ফেটে গেল। ও' ব্রায়েন সাহেব এসে পরীক্ষা করে জানালেন, এ যাত্রা রোগী রক্ষা পেয়ে গেলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কিছু না বলে শুধু হাসলেন।

এ হাসির অর্থ তখন বোঝা যায়নি। কিন্তু দু তিনদিন পরেই পুরনো ফোড়ার পাশে নতুন একটি ফোঁড়া দেখা দিল। সকলেই বুঝলেন, মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে।

২৫শে চৈত্র তাঁর বাক্‌রোধ হল। কিন্তু তখনো তাঁর জ্ঞান ছিল। ২৬শে চৈত্র (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি দেহত্যাগ করলেন।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক তাঁর বাড়িতে এসে জমা হতে লাগল। শহরের জ্ঞানীগুণী, সংস্কৃতি-অনুরাগী এমন কেউই ছিলেন না যিনি সেদিন এই সাহিত্যরথীকে শেষবার দেখতে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসেননি।

তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে যে বিরাট শোকযাত্রা সেদিন কলকাতার পথে পথে নীরবে অশ্রুবিসর্জন দিয়েছিল, সে যুগে অতো মানুষ আর কারো জন্যেই ঘরের বাহির হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র যে বাঙালীর কাছে কতো প্রিয় ছিলেন, সেদিনই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

বছরের পর বছর কেটে গেছে, সে শ্রদ্ধা এতটুকু ম্লান হয়নি, বরং বেড়ে গেছে শতগুণে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর সারা বাংলা দেশে শোকসভার আয়োজন হ'তে থাকে। কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট নাগরিক শোকসভা আহূত হয়। আসামের ভূতপূর্ব চিফ-কমিশনার কটন সাহেব তাতে সভাপতি হ'য়ে মন্তব্য করেন, "বাংলার সমুজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়ল।" কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ দাস ইত্যাদি কবিতায় শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। হেমচন্দ্রের রচিত কবিতার কয়েকটি ছত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্তি অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে ধরা দিয়েছে।—

কে পারিবে তব রাজদণ্ড নিতে
তিলক ধরিতে ভালে?
তোমার মতন সাধক রতন
পাব আর কত কালে?
বিহনে তোমার করে হাহাকার
বঙ্গ নরনারী আজ,
হে বঙ্গভূষণ প্রিয় অতুলন
বঙ্গের সাহিত্য-রাজ!

* * *

আপনি গঠিলে আদনার ফল
সোদর সদৃশ প্রেমে;
শত ডোর দিয়া হৃদয়ে বাঁধিলে
কত রবি চন্দ্র হেসে!'

উল্লিখিত কবিতাংশের শেষ পংক্তিতে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের নাম করা হ'য়েছে। এঁরা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে সখেদে লিখেছিলেন—

......"আজ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও আমরা সভা ডাকিয়া সাময়িক পত্রে বিলাপসূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আপনার কর্তব্য সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তাহার অধিক আর কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না।......

"উপকার গ্রহণ করিবার শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার শক্তিও বাড়িতে থাকে। আমাদের দেশের জাতীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও সেরূপ দাঁড়ায় নাই যাহাতে আমরা

কোনো মহৎ লোকের দৃষ্টান্ত বা কার্য অন্তরের মধ্যে যথার্থরূপে পরিপাক করিয়া লইতে পারি।......

"সেইজন্য যে কয়েকটি মহাত্মা আমাদের দেশের কাজে জীবন বিসর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মিশরের বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে গুটিকতক নিঃসঙ্গ পিরামিডের মতো দেখিতে হয়। এই মৃত মরুভূমির মধ্যে তাঁহাদের সমুন্নত মহিমা দ্বিগুণ দেদীপ্যমান হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সুবিশাল বিষাদ হৃদয়কে বাষ্পাকুল করিয়া তোলে। হায়, এত বড় জীবন যাহার নিকট নিঃশেষে সমর্পিত হইয়াছে, সে জানিতেও পারিল না তাহার কি সৌভাগ্য এবং সে চিরদিনের জন্য কতখানি লাভ করিল।"

মৃত্যুর বছর দুই আগে বঙ্কিমচন্দ্র 'রায় বাহাদুর' উপাধি পান। কিন্তু এ উপাধিতে বঙ্কিমচন্দ্র বা দেশবাসীগণ মোটেই খুশী হন নি। সেকালে 'সাহিত্য' নামক পত্রিকায় 'উপাধি উৎপাত' নামক প্রবন্ধে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছিলেন—

'সেদিনকার উপাধিসভা মনে পড়ে। লোকের দৃষ্টি সমবেত মণ্ডলীর মধ্যে একজনের উপর পড়িল। তিনি আর কেহ নহেন—রায় বঙ্কিমচন্দ্র বাহাদুর। অত রাজা, মহারাজা, নবাব থাকিতে, একজন রায়বাহাদুরের প্রতি সকলের যে নজর পড়িল, তাহার যথেষ্ট কারণ অছে। রাজপ্রসাদে মানুষ ধন্য হয় না—নিজগুণে ধন্য হয়, একথা আমরাও—উপাধিলোভী জাতি জানি। যদি কখন আমাদের জাতীয়-গৌরব হয়, যদি কখন আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে অপর জাতিকে প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত রত্ন সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃভূমিকে লোকে স্বর্ণগর্ভা বলিবে। ততদিনে রাজা, মহারাজা, নবাবের দল কে কোথায় বিস্মৃতিসাগরে তলাইয়া ডুবিয়া যাইবে, কে বলিতে পারে? এই কথা বুঝিতে পারিয়া সকলে বলিয়াছিল যে, 'রায়-বাহাদুর' উপাধি দিয়া বঙ্কিমবাবুর প্রতি অবমাননা প্রকাশ করা হইল।"......

এই রচনা প্রকাশের কিছুদিন পরে 'সাহিত্য'-সম্পাদক একখানি 'বিশ্বস্ত' পত্র পেলেন। তাতে পত্রলেখক জানালেন, "নিজে উপাধিপ্রার্থী হওয়া দূরে থাক, গেজেটে উপাধি তালিকা মুদ্রিত হইবার পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু এ সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই।"

পরে জানা গেছে, এই পত্রের লেখক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। সুতরাং অবিশ্বাসের কারণ নাই।

মৃত্যুর কিছু আগে বঙ্কিমচন্দ্র সি, আই, ই উপাধি পান। কিন্তু গুরুতর অসুস্থতার জন্যে দরবারে উপস্থিত হননি।

এই উপাধিলাভের পর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রকে লেখেন—"আপনাকে সম্মানিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে সম্মানিত করিয়াছেন।"

উত্তরে রোগশয্যা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, "আমি জানি, যে কথা আপনি বিশ্বাস করেন না, বা সত্য বলিয়া মনে করেন না, সে কথা কখনও আপনি বলেন না বা লিখেন না। আমি চিরদিন আপনার পত্রখানি যত্নপূর্বক রক্ষা করিব।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রও গুরুদাসবাবু সযত্নে রক্ষা করেছেন।

৯। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন

(নানাবিষয়ে মতামত ও বিশ্বাস)

ব্যক্তিগত জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। কারো সঙ্গেই যেচে আলাপ করতেন পারতেন না। কিন্তু যাঁরা তাঁর নিকট গণ্ডীতে একবার প্রবেশাধিকার পেয়েছেন, তাঁরাই স্বীকার করেছেন, তাঁর হৃদয় ছিল তাঁর মহত্ত্বের অনুরূপ উদার।

হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্ম আন্দোলন নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে অনেকের মসীযুদ্ধ হয় সে সময়ে। তার মধ্যে যুবক রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"সেই লড়াইয়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচার-এ তাহার ইতিহাস রহিয়াছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক, এ বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

অথচ যখন কঠিন হ'তে হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র কঠিনও হ'তে জানতেন।

'বঙ্কিমজীবনী'-কার শচীশচন্দ্র জানিয়েছেন, "একবার পাইকপাড়ার রাজা স্বর্গীয় ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আলাপ করিতে সমুৎসক হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত (বাঁশবেড়িয়ার জমিদার) ললিতবাবু ছিল; তিনি ললিতবাবুকে ধরেন। ললিতবাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে সে কথা জানাইলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, "উঁহার সহিত আমার আলাপ অসম্ভব।"

এ গেল একরকম, নীতির কথা। অপরিচিত লোকের সঙ্গে গভীর বিষয়ে আলাপ করতেও বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি ছিল। তাঁর মৃত্যুর তিন-চার বছর আগে যুবক দীনেশচন্দ্র সেন একবার জনৈক বন্ধুর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুই বন্ধুর কেউই বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনতেন না, বাড়ীর নম্বরও জানতেন না।

গলির মধ্যে, কিছুদূর গিয়ে একটা বাড়ী তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সদর দরজায় এসে তাঁরা দেখলেন, একজন ভদ্রলোক উঠানে দাঁড়িয়ে একজন ভৃত্যকে অত্যন্ত তিরস্কার করছেন। তাঁর রাগের ভয়ে আগন্তুক যুবক দুজন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন ভদ্রলোব ভৃত্যকে ছেড়ে তাঁদের ধরলেন, "আপনাদের কি প্রয়োজন?"

'বঙ্কিম জীবনী'-কার তারপর লিখছেন—

দীনেশবাবু। এটা কি বঙ্কিমবাবুর বাড়ী।
ভদ্রব্যক্তি। হাঁ।
দীনেশবাবু। আমরা বঙ্কিমবাবুর দর্শনপ্রার্থী।
ভদ্রব্যক্তি। প্রয়োজন কিছু আছে?

দীনেশবাবু। প্রয়োজন কিছু নাই; আমরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুদূর হইতে আসিতেছি।

ভদ্র ব্যক্তি। কোথা হইতে আসিতেছেন?

দীনেশবাবু। কুমিল্লা হইতে।

ভদ্র ব্যক্তি। আচ্ছা আপনারা উপরে যান; সেইখানে বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাৎ পাইবেন। উপরে উঠিয়া উভয়ে বৈঠকখানায় আসিলেন। ক্ষণপরে পূর্বকথিত ভদ্রলোকটি একটা পিরান গায়ে দিয়া আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে বসিলেন। উভয়ে তখন বুঝিলেন, নীচে যাঁহার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তিনিই বঙ্কিমবাবু। তখন তাঁহারা কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। দীনেশবাবু যত সাহিত্যের কথা টানিয়া আনেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা উল্টাইয়া দিয়া ততই ধানচালের কথা পাড়েন।

"দীনেশবাবু যদি জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি এক্ষণে কি লিখিতেছেন?" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দেন, 'কুমিল্লায় কিরূপ ধান হয়?' অবশেষে দীনেশবাবু বুঝিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনেশবাবুর মত লোকের সহিত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি তখন আর কোনো কথা না তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবল নীরস কঠিনহৃদয় ছিলেন না, সেই কঠিনতার অন্তরালে করুণার স্রোতও বইত তাঁর মনে তারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর তলায় তখন একটা বড় মেলা বসত। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময় একদিন গঙ্গার ধারে তাঁর বাড়ি থেকে দেখলেন, একখানি ছোট নৌকায় অজস্র লোক উঠেছে, প্রায় ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থা, তবু মাঝি লোক নিচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র ডেকে মাঝিকে নিষেধ করলেন, শেষে আইনের ভয়ও দেখালেন, কিন্তু পয়সার লোভে মাঝি তাঁর কথায় কান দিল না। আরো অনেক লোক তুলে নৌকা ছেড়ে দিল। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই, বঙ্কিমচন্দ্র যা ভয় করেছিলেন, নৌকা উল্টে গেল। ডাঙা কাছে ছিল। অন্য মাঝিরা তাড়াতাড়ি নৌকাখানি ডাঙায় টেনে আনল, প্রাণহানি ঘটল না। কিন্তু অত্যন্ত রুষ্ট হ'য়ে বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে তখনই পুলিশের হাতে দিলেন।

তার নামে মামলা হল। বিচারে তার জেল হল তিন মাসের। কিন্তু জেলের মধ্যেই কী একটা অসুখে তার মৃত্যু হয়।

এ খবর শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। তিনি হতভাগ্য মাঝির বিধবার সন্ধান করিয়ে এনে কিছু অর্থ সাহায্য দিলেন এবং যতদিন সে বেঁচে ছিল তার একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করলেন।

আরেকবার বঙ্কিমচন্দ্র তখন নাগোয়ার কাজ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ সেই সময় তমলুকে হাকিম ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে একদিন পাল্কীতে ক'রে তিনি তমলুকে আসছিলেন। পথে হলদি নদীর উপরে একটি খেয়া আছে। তার নাম নরের ঘাট। সেখানে এসে দেখলেন, খেয়া নৌকাটি ঘাটে লাগানো রয়েছে, কিন্তু মাঝি নেই।

তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। সকাল থেকে পাল্কীতে এসে বঙ্কিমচন্দ্র ক্লান্ত। সেই অবস্থায় মাঝিকে না দেখে তিনি অত্যন্ত রেগে গেলেন।

নদীর পাড়ের উপর একখানি ছোট চালাঘর দেখা গেল। সেটাই মাঝির অবসরের আশ্রয়। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেখানে সে নেই।

এদিকে পাল্‌কী দেখে গাঁয়ের কিছু লোক এসে হাজির হ'য়েছিল। তাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, মাঝির বাড়ি গাঁয়ের অন্য দিকে। একজনকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চাপরাশি তখন মাঝির খোঁজে ছুটল।

রাস্তাতেই তার সঙ্গে মাঝির দেখা হল। তারপর মাঝিকে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে সে হাজির করল হাকিমের কাছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, খেয়া ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া যে অপরাধ তা কি সে জানে ?

মাঝি কেঁদে ফেলে বলল, "হুজুর! আমার ছোট মেয়েটির ওলাউঠা হ'য়েছে বদ্যিতে জবাব দিয়েছে।"

সঙ্গে সঙ্গে চেহারা বদলে গেল হাকিমের। কোথায় গেল রাগ, কোথায় গেল তমলুক যাওয়া। তৎক্ষণাৎ মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িতে চলে এলেন তিনি তারপর গায়ের দু'চারজন মাতব্বরকে ডেকে, চিকিৎসককে ডাকালেন। তারপর মাঝিকে কিছু টাকা দিয়ে অন্যদের বললেন, "অসুখের সময় তোমরা একে সাহায্য কর নাই এটা খুবই অন্যায় কথা। আমি ফিরিবার সময় সংবাদ লইব তোমরা রোগীর কিরূপ যত্ন লইয়াছ।"

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। অন্তরঙ্গ সুহৃদদের সংখ্যা অবশ্য তাঁর বেশী ছিল না। কারই বা থাকে! কিন্তু যাঁদের তিনি একবার আপন বলে কাছে টেনে নিয়েছিলেন জীবনে, এমনকি মরণেও তাঁদের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি।

তাঁর একজন বন্ধুর নাম আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। তিনি দীনবন্ধু মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে দীনবন্ধু বছর দশেকের বড় হলেও দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল অকৃত্রিম। দীনবন্ধুর মৃত্যু হয় আগে। কিন্তু তখন 'বঙ্গদর্শন' সচল থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মৃত্যুর পরে কিছু লেখেননি তাঁর সম্বন্ধে। তারপর 'বঙ্গদর্শন'কে যখন তিনি বিদায় দিতে বাধ্য হলেন, তখন গভীর বেদনার সঙ্গে লিখলেন—

"আমার আর একজন সহায় ছিলেন, সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখদুঃখের ভাগী, তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গ-সমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গ-দর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখ করি নাই ; কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ কে তাহার ভাগী হইবে। কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে। অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক, আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু। আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখন কিছু বলি নাই, এখনও কিছু বলিলাম না।"

দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র লিখেছেন—

"অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, বন্ধুত্ব বন্ধুর মৃত্যুর সহিত ফুরাইয়া যায়। আমার পিতৃদেবের অনেক বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকেরই বন্ধুত্ব ক্ষণস্থায়ী হইয়া

ছিল। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর বন্ধুত্ব সে জাতীয় ছিল না। আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর তিনি আমাদিগকে ভ্রাতুষ্পুত্রের ন্যায় দেখিয়াছিলেন। ......তিনিই পিতৃদেবের রচনাগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশ করিতে বলেন এবং নিজে পিতৃদেবের একটি ক্ষুদ্র জীবনীও লিখিয়াছেন। ....তিনি ইহাকে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপিবার অনুমতি দেন এবং এই জীবনী সে অবধি আমাদের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। ইহার উপস্বত্বও আমরা ভোগ করিতেছি। মৃত বন্ধুর পুত্রগণের প্রতি এই স্নেহের চিহ্ন অতীব বিরল। ....

........."পিতৃদেবের গ্রন্থাবলী দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইবার সময় তিনি আমাদিগকে একখানি ইংরাজী পত্র পাঠান। তাহার আরম্ভে লিখিয়াছিলেন, I owe it to the memory of your father that I should give a critical estimate of his writngs? 'দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব' শীর্ষক (সেই) প্রবন্ধের উপসংহারে (তিনি) লিখিয়াছিলেন, '..............দীবনন্ধুর স্নেহ ও প্রীতি-ঋণের যতটুকু পারি পরিশোধ করিব এই বাসনা ছিল। তাই এই সমালোচনা লিখিবার জন্য আমি তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য।'..........."

এমন অকৃত্রিম বন্ধুত্ব সত্যিই দুর্লভ। বঙ্কিমচন্দ্র যে কতো উচ্চ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাঁর কর্তব্যজ্ঞান মমতাবোধ যে কতো গভীর ছিল এর থেকে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায় তার।

তেমনি ছিল তাঁর কৃতজ্ঞতা বোধ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন তাঁর বাল্যকালের সাহিত্যগুরু। নিজে তিনি পরবর্তী জীবনে কবিতা লেখেন নি, তাঁর রচনার মধ্যেও ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। তবু পরিণত জীবনে খ্যাতি চূড়ায় অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি গুপ্তকবির কথা ভুলতে পারেন নি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিতাসংগ্রহ' সম্পাদনা ক'রে এক দীর্ঘ ভূমিকায় গুপ্ত কবির প্রতিভার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন। ঐ ভূমিকার চেয়ে ভালো গুণগ্রাহী সমালোচনা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার আর হয়েছে কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র যে কতখানি ঐতিহ্য-পুষ্ট এবং সুসমালোচক ছিলেন, ভূমিকাটি তারই এক আশ্চর্য উদাহরণ।

তেমনি "আলালের ঘরের দুলালে"র লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনাবলীর পুনঃ প্রকাশও বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহেই ঘটে থাকে। তিনি প্যারীচাঁদের পুত্র নগেন্দ্রলাল মিত্রকে ডেকে এ বিষয়ে তৎপর হ'তে বলেন এবং একটি ভূমিকা লিখে দিতে উৎসাহী হন।

সে ভূমিকাটি আয়তনে দীর্ঘ না হলেও ওজনে যথেষ্ট ভারী। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী পাঠককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক। ....বাংলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। আর দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য

ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। ....প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল"।' ....

বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক তাঁর সাহিত্য গৌরবের দীপ্তিমান মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়ে একজন বিস্মৃতপ্রায় পূর্বগামীর প্রতি যে অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাতে তাঁর হৃদয়ের প্রসারতা এবং কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয় পেয়ে অবাক হ'তে হয়।

সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য অনেক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মতামত লিপিবন্ধ ক'রে গেছেন। ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন না বলে সভাসমিতিতে তিনি খুব কমই যেতেন, কিন্তু সে যুগের সামাজিক জীবনের সমস্ত সমস্যার বিষয়েই তিনি তাঁর লিখিত মতামত ব্যক্ত করে গেছেন।

সমুদ্রযাত্রা সেকালে হিন্দুদের পক্ষে নিষিন্ধ ছিল। যাঁরা যেতেন তাঁরা সমাজে পতিত হতেন। কাঁঠালপাড়ার কাছে গরিফা গ্রামের একজন ভদ্রলোক পড়াশোনার জন্যে বিলেত গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি 'একঘরে' হলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারই তখন ও তল্লাটে সমাজের নেতা। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ তাঁকে সমাজে স্থান দিতে সম্মত হলেন না।

ভদ্রলোক নিয়মমতো 'প্রায়শ্চিত্ত' করলেন। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কলকাতায় থাকেন। ভদ্রলোক তাঁকে গিয়ে ধরলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কুসংস্কার ছিল না। তাঁর মনে দয়া হল। ভেবে চিন্তে তিনি উপদেশ দিলেন, "দেখ, এক রবিবারে তুমি আমায় নিমন্ত্রণ কর, আমি তোমার বাড়ীতে গিয়া খাইয়া আসিব।"

তাই ঠিক হল। বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা থেকে গরিফায় গিয়ে তাঁর বাড়িতে আহার করলেন। এবং ফেরার পথে নিজের বাড়িতে গিয়ে জ্যেষ্ঠকে বললেন, "দাদা, একটা কাজ করেছি।"

শ্যামাচরণ। কি কাজ ?

বঙ্কিমচন্দ্র হেসে ফেলে বললেন, "রায়েদের বাড়ী খেয়ে এসেছি।"

ভদ্রলোক সমাজে স্থান পেলেন।

এই সমুদ্রযাত্রার বিষয়ে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব একবার বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত জিজ্ঞাসা করে চিঠি লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তার উত্তরে জানান,—

........."শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ-সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি বিশ্বাস করি না। ......আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম সম্বন্ধে এবং নীতিসম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religious and moral Regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্র বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্তন করা যায় না। ....যদি মহাভারতকার মিথ্যা না লিখিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম। এই সমুদ্র-যাত্রাপদ্ধতি লোকহিতকর কিনা? যদি লোক হিতকর হয়, তবে ইহা স্মৃতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইলেও কেন পরিত্যাগ করিব। ....সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্র-যাত্রা হিন্দুধর্মানুমোদিত।"

সেকালের আরেক বহু-আলোচিত বিষয় ছিল বহু-বিবাহ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি পুস্তিকা প্রচার ক'রে বহু-বিবাহ যে অশাস্ত্রীয় তা প্রমাণ করলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ইত্যাদি পাল্টা প্রমাণ দিয়ে জানালেন, বহু-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তিকার আলোচনা প্রসঙ্গে যা লিখেছিলেন তা প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখেছিলেন—

"বহু-বিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জনীয় এবং স্বাভাবিক নীতি-বিরুদ্ধ, তাহা বোধহয় এদেশের জনগণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এদেশে এমত লোক বোধহয় অল্পই আছে, যে বলিবে, 'বহুবিবাহ অতি সুপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।'

"কিন্তু এই বহু-বিবাহরূপ রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষ হইলেও বধ্য। যিনি এই মুমূর্ষু রাক্ষসের মৃত্যুকালে দুই-এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষেও শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করে আন্দোলন করেছিলেন সে সময়ে। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানান। তিনি লিখেছেন—

"বিধবা-বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে ; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছা মতো বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। ......যদি পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, সাম্য নীতির ফলে স্ত্রী পতি-বিয়োগের পর অবশ্য ইচ্ছা করিলে পুনর্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী।"

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের কথা, সমাজের কর্তা পুরুষের কথা তুলেছেন। পুরুষ-শাসিত সমাজে পুরুষের স্বার্থের দিকে চোখ রেখেই যে সমাজের ব্যবস্থা হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বিধবা হলে যদি বিবাহের অধিকার থাকে তবে স্ত্রীরা যথেষ্ট স্বামীপরায়ণা হবেন না, এই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করে বলেছেন, তবে পুরুষের পত্নীবিয়োগে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের অধিকার লুপ্ত হোক—তাতে দাম্পত্য-বন্ধন আরো দৃঢ় হবে। শেষে গভীর ক্লেশ ও বেদনার সঙ্গে বলেছেন—

'তুমি বিধানকর্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর এবং ধর্মবিরুদ্ধ বৈষম্য।"

সমাজে সমতা আনার জন্যে, আমাদের সামাজিক জীবনের সুষম বিকাশের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষারও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন,—

"সকলেই এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? যাঁহারা, পুত্রটি এম· এ· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কন্যাটিকে কথামালা সমাপ্ত

করাইয়া চরিতার্থ হন। কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম· এ· পাশ করিবে না, এ প্রশ্ন বারেকমাত্রও মনে স্থান দেন না।

"বাস্তবিক বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্ত্রীগণকে পুরুষের মত লেখাপড়া শিখাইবার উপায় নাই। বঙ্গবাসীগণ যদি স্ত্রীশিক্ষার যথার্থ অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত।

"সেই উপায় দ্বিবিধ। প্রথম, স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক বিদ্যালয়—দ্বিতীয় পুরুষ-বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণের শিক্ষা।

"দ্বিতীয়টির নাম মাত্র বঙ্গঋষিগণ জ্বলিয়া উঠিবেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহে মনে বিবেচনা করিবেন যে, পুরুষের বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই কন্যাগণ বারাঙ্গনাবৎ আচরণ করিবে। মেয়েগুলা ত অধঃপাতে যাইবেই; বেশীর ভাগ ছেলেগুলাও যথেচ্ছাচারী হইবে।......

স্ত্রীশিক্ষা বিধেয় কিনা? বোধহয় সকলেই বলিবেন—'বিধেয় বটে।'

"তারপর জিজ্ঞাসা—কেন বিধেয়? কেহ বলিবেন না যে চাকরীর জন্য। বোধহয় এতদ্দেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোক উত্তর দিবেন যে, স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জন এবং বুদ্ধি মার্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখান উচিত।"

এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণভাবে শিক্ষা, মাতৃভাষার উন্নতি, লোকশিক্ষা ইত্যাদির বিষয়েও অনেক কথা বলে গেছেন। তাঁর যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সারবত্তা উপলব্ধি ক'রে অবাক হ'তে হয়।

দেশের প্রকৃত শিক্ষা যে মাতৃভাষার সাহায্য ছাড়া হ'তে পারে না, বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা প্রায় সত্তর-আশী বছর আগে অনুভব করেছিলেন। গভীর অনুতাপের সঙ্গে তিনি লিখেছেন—

"ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গলা ভাষায় লেখকমাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য, নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক।

"......সুতরাং বাংলা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়স্ক পৌরকন্যা এবং কোন কোন নিষ্কর্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছে আদর পায়। কদাচিৎ দুই একজন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাংলা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।"

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী ভাষার প্রাদুর্ভাবের নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে শেষে মন্তব্য করেছেন—

"আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।"

অথচ তিনি ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন না। কিন্তু মাতৃভাষার অনাদর

ক'রে আমরা প্রাণপণ চেষ্টায় ইংরেজ ব'নে যাব, এ তিনি চান নি। 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে তিনি তার কারণ জানিয়ে বলেছেন,—

"শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিক চাঁদ তিলার্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট সাহেব, এদেশে সার অস্‌লি ইডেন্‌ ইঁহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্‌, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাট লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাট লক্ষ নব্বুই হাজার নয় শ'—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কী হইবে? ইংরেজ ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাটি লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাংলার লোক যে শিখিল না। বাংলায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।"......

এর জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে গভীর সমবেদনার প্রয়োজনের কথা বলেছেন, উভয় শ্রেণীর মেলামেশার কথা বলেছেন। অন্যদিকে জাতীয় উন্নতির জন্যে যে ইংরেজী শিক্ষারও দরকার আছে তাও তিনি জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করে গেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিশেষভাবে বিজ্ঞানচর্চার উপদেশও দিয়েছেন। ইংরেজ যে তার উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্যেই ভারতবর্ষের মতো এতবড় দেশকে শাসন করছে, বঙ্কিমচন্দ্র তা স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছেন,—

"বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু।......

"বিজ্ঞান সহায়তা শকট বাহনে, তড়িৎ-তার সঞ্চালনে, কামান সন্ধানে, আয়োগোলক বর্ষণে এই বীরপ্রসূ ভারতভূমি হস্তামলকবৎ আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে। বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদিগকে ক্রমশঃই নির্জীব করিতেছে। যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে। আমরা দিন দিন নিরুপায় হইতেছি। অতিথিশালায় আজীবনবাসী অতিথির ন্যায় আমরা প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি। এই ভারতভূমি একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালা মাত্র।"

বিজ্ঞানকে নিজের ক'রে নেওয়ার জন্যে এই আবেদন কতো দূরদর্শিতার ফল. ভারতবর্ষের লোক প'চিশ বছর পার না হ'তেই জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধে জাপানের জয়ের সময় তা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল। বিজ্ঞান-বলেই যে দেশকে উন্নত করা যায়, তাও উপলব্ধি করল। বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে বিজ্ঞান-সাধনা এবং অন্যান্য জাতীয় গুণের প্রতিযোগিতা করে আমরা ইংরেজের সমকক্ষ হই। তাহলে আমাদের পরাধীনতার বন্ধন আপনিই খ'সে পরবে। তিনি তাই বলেছেন—

"......আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে।........ ইংরেজের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহাসিত হইলে, যতদূর আমরা তাহাদের সমকক্ষ

হইবার যত্ন করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু-বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না—কেন না সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না।...... উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক, উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়।"......

বঙ্কিমচন্দ্র রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না, ছিলেন সাহিত্যিক। তখন কয়েকটি কৃষকবিদ্রোহ ছাড়া কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনও দেশে আরম্ভ হয় নি। কিন্তু রাজনৈতিক মতামত তাঁর রচনায় ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে অনেক স্থানেই ছড়ানো আছে।

কিছুকাল পরে 'কংগ্রেস' স্থাপিত হয়। তখন পর্যন্ত, ঐ 'জাতীয় মহাসভা' উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবী মহলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি ছিল এই আন্দোলনের প্রতি, কিন্তু যথেষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব নেই বলে, তিনি এতে যোগদান করেন নি। তার আগে 'ভারতসভা' নামে এক প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে তিনি বলেছিলেন,

"ভরসা করি এতদিন পরে এরূপ একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহা উপযুক্তরূপে দেশীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ হইবে।"

কিন্তু সে আশা সফল হয়নি। পরবর্তীকালে, চাকরি থেকে বিদায় নেওয়ার পর, বিজয়লাল দত্ত একবার বঙ্কিমচন্দ্রকে কংগ্রেসে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্মত হন না। দত্ত মহাশয় তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

"কংগ্রেসের প্রতি আমার সহানুভূতি নাই, এ কথা আমি কখনই বলিতে পারি না—উহার উদ্দেশ্য মহৎ, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে প্রণালীতে উহার কার্য পরিচালিত হইতেছে, আজ পর্যন্ত উহা সাধারণের যোগদানের উপযুক্ত হয় নাই। উহার সমস্ত আন্দোলন যেন ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসার শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা এখনও সমস্ত দেশের লোকের সম্পত্তি হয় নাই।"

কংগ্রেসকে "দেশের লোকের সম্পত্তি" করার গৌরব মহাত্মা গান্ধীর। বঙ্কিমচন্দ্র যে কতো বড় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, গান্ধীজীর উপলব্ধি এবং কর্মনীতি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

১০। ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য

(ঋষি, না সাহিত্যিক ?—উত্তরাধিকার)

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তাঁর চোখেমুখে এমন দীপ্তি ছিল, আচার আচরণে এমন স্বাতন্ত্র্য ছিল যে হাজার লোকের ভিড়েও অদ্বিতীয় হ'য়ে দেখা দিতেন। একবার মহারাজ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকতকুঞ্জ' নামক বাড়িতে একটি সভার আয়োজন হয়। সভার নাম 'কলেজ-রিয়ুনিয়ন'। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং কৃতী ব্যক্তি। সেই সভার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন, তা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব কত প্রখর ছিল তা বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"......আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুক প্রফুল্ল মুখ গুম্ফধারী (তখন বঙ্কিমচন্দ্র মুণ্ডিত-গুম্ফ ছিলেন না) প্রৌঢ় পুরুষ চাপকান পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারো পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী এক সঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান পাইয়া জানিলাম, তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিত-দর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু।"

মানুষের প্রতিভা তার চেহারার উপরেও ছায়া ফেলে। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটেনি। কিন্তু প্রতিভা বলতে আমরা যে একটা ঐশ্বরিক ক্ষমতার কথা বুঝি, প্রতিভার আসল রহস্য ঠিক তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়া তো প্রাথমিক ব্যাপার, কিন্তু শুধু সেইটুকু পুঁজিতেই লোকোত্তর কীর্তির ছাপ রাখা যায় না। তার সঙ্গে দরকার হয় নিয়ত সাধনা, অর্থাৎ পরিশ্রমের ক্ষমতা। অনুশীলনের অভাবে প্রথমশ্রেণীর প্রতিভাও অকালে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার একাগ্র চর্চায় সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেকদূর এগোনো সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন, এ তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেবল সেইটুকুই সব কথা নয়। পরিশ্রম করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ।

ছাত্রজীবনে যে তিনি জ্ঞানলাভের জন্যে কতখানি নিযুক্ত রেখেছিলেন নিজেকে, পরবর্তীকালে তাঁর রচিত সাহিত্যের দিকে চোখ রাখলেই আমরা তা বুঝতে পারি। আবার কর্মজীবনেও তিনি কতদূর পরিশ্রমী ছিলেন তা তাঁর তেত্রিশ বছর ব্যাপী ডেপুটিগিরির কঠিন দায়িত্ব এবং সেই সঙ্গেই ক্রমাগত উপন্যাস রচনা ও 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায় অন্যান্য গদ্য নিবন্ধ প্রকাশে স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়ে। বঙ্কিমজীবনীকার জানিয়েছেন, প্রতিদিন রাত আটটা থেকে তিনি লিখতে বসতেন, এবং প্রায় দুটো পর্যন্ত লিখেই চলতেন। পরদিন আবার আদালত। ভাবতেও অবাক লাগে।

একবার কোনো ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা করেছিলেন।

তাঁর অভিযোগ ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সারারাত উচ্ছৃংখল জীবনযাপন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তা শুনে বলেছিলেন—

"তোমার কথা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। লোকটা সমস্ত দিন গভর্ণমেণ্টের কাজে ব্যস্ত থাকে, আবার রাত্রিও যদি এই রকমে কাটায়, তবে বই লিখতে সময় পায় কখন? তার কেতাবে যে আমার আলমারির একটা সেল্‌ফ ভরে গেল!"

বিদ্যাসাগর মহাশয় ঠিকই বুঝেছিলেন। সময়ের অপব্যয় বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই করতেন না। সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ছাড়া অন্যভাবে তিনি সময় নষ্ট করতেন না। অবশ্য আলাপ-আলোচনাকে সময়ের অপব্যয় মনে করতেন না তিনি, তাঁর মতে সেটাও সাহিত্যকর্মের অন্তর্গত।

বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্র ছিল সুবিস্তৃত। তার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল নিজের লেখা, অন্যদিকে তেমনি ছিল লেখক তৈরীর দায়িত্ব। রমেশচন্দ্র দত্তের বাংলা রচনায় উৎসাহিত হওয়ার রহস্য তো আগেই উদঘাটিত করা হয়েছে। তাছাড়া চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইত্যাদি বহু লেখকই বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছেন।

তা বলে বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবল প্রশংসাই করতেন, তা নয়। সেযুগের 'বঙ্গদর্শনে'র পাতা উল্টালেই দেখা যায়, যোগ্যব্যক্তির সমাদরে তিনি ছিলেন যেমন অকৃপণ, অযোগ্যের দোষ ব্যাখ্যাতেও ছিলেন তেমনি কঠোর। সমালোচক হিসাবে তিনি ছিলেন পক্ষপাতহীন এবং একচ্ছত্র। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বঙ্কিম যেদিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন, সে দিন হইতে এ পর্যন্ত আর সে আসন পূর্ণ হইল না। এখনকার অরাজকতার চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্য-সিংহাসনে কে আমাদের রাজা ছিলেন, এবং তাঁহার অভাবে শাসনভার গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই উপস্থিত নাই।"

রাজার মতোই সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের কুৎসা রটনাকারীর সংখ্যাও কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

"বঙ্কিমচন্দ্রের উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।......

"ছোট ছোট দংশনগুলি যে বঙ্কিমচন্দ্রকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল।"

বঙ্কিমচদ্র উদ্দেশ্যহীনভাবে কোনো কাজ করতে ভালবাসতেন না। 'বঙ্গদর্শন' স্থাপিত করেছিলেন তিনি বাংলা রচনার একটা মান প্রতিষ্ঠার জন্যে, বাঙ্গালী পাঠকের রুচি পুষ্টির জন্যে। তাঁর উপন্যাসাবলীরও মূল তাৎপর্যও তাই। তিনি আমাদের নিজেদের পারিপার্শ্বিকের দিকে চোখ ফিরাতে শেখালেন, স্বাজাত্য বোধ ও স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত করলেন। সেদিক থেকে তাঁর সমগ্র সাহিত্য জীবনই উদ্দেশ্য-

মূলক। তিনি "বাংলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন"-এ যা বলেছেন, তা থেকে তাঁর সাহিত্যিক মতাদর্শ কী ছিল সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন—

"যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।......

"যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য, অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহা পাপ।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসেবার মূল উদ্দেশ্য ছিল লোকহিত ও সৌন্দর্যসৃষ্টি। এ দুটোই অংগাংগী সম্বন্ধযুক্ত। কারণ শুধু উপদেশ দিলে সাহিত্যের কাজ সম্পূর্ণ হয় না, উপদেশ সাহিত্য-রসাশ্রিত হওয়া চাই। অন্যদিকে নিছক শিল্পের জন্যেই শিল্পসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন নেই, কারণ তাতে সত্যানুসন্ধান বা লোকহিতের স্পর্শ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যের মধ্যেই এই অতি উচ্চ মতাদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়।

নিজের যুগের বিশেষ বক্তব্যকে ভাষা দিয়েই একজন লেখক যুগপ্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে পারেন। কিন্তু সমাজপ্রগতি সব সময়ে এক হারে চলে না। সব দেশেই এমন এক একটা সময় আসে যখন রূপান্তরের গতি হয় অত্যন্ত দ্রুত। বঙ্কিমচন্দ্র যেকালে সাহিত্য রচনা করেছেন, সে সময়টাও আমাদের দেশে সমাজের পরিবর্তন ঘটছিল খুবই দ্রুতগতিতে। বলা যায়, সে ছিল একটা যুগসন্ধির আমল। পুরাতন ধ্যানধারণা থেকে নতুন ধ্যানধারণায় উৎক্রমণের যুগ। সে যুগে অনেক সাহিত্যিকেরই প্রভাব হয়েছিল ক্ষণস্থায়ী। কারণ তাঁরা সময়ের গতির সংগে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠেন নি। খণ্ডকালের বক্তব্যকে ভাষা দিয়েই তৃপ্ত করতে হয়েছিল তাঁদের। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এর মহৎ ব্যতিক্রম।

তাঁর জীবনীশক্তি এত প্রবল ছিল যে, আমরণ তিনি সময়ের আগে আগে চলেছেন, পিছিয়ে পড়েন নি কখনো। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর বিষয়ে যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তিনি বলেছেন—

......"বঙ্কিমচন্দ্র হইতে বয়সে অনেক কনিষ্ঠ হইলেও আমরা যে যুগে জন্মিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগেরই লোক।...... যে ভীষণ যুগসন্ধিকালে, বিরুদ্ধ ভাব ও চিন্তাস্রোতের আবর্তে পড়িয়া, সেকালের ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতিগতি ঘূর্ণিপাকে পতিত তরণীর মতন বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছিল; আর যে কালে, যে আবর্তের মধ্যে স্বদেশের ও স্বজাতির চিন্তাতরণীকে স্থির রাখিবার জন্য, বঙ্কিমচন্দ্র আপনার বজ্রমুষ্টিতে তার কর্ণধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; আমরা সেই যুগসন্ধি-সময়ে জন্মিয়া, সেই চিন্তাবর্তের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া, ডুবিয়া ভাসিয়া, বাড়িয়া উঠিয়াছি।......

"এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই দিন দিন ইহা বদলাইয়া গিয়াছিল। দুর্গেশনন্দিনীর রচনা-কালের

আর আনন্দমঠের রচনাকালের মধ্যে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের চিন্তারাজ্যে যুগান্তর ঘটিয়াছিল। এই সকল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আপনিও পরিবর্তিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র কোনও দিন আপনার পরিবর্তিত ও পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যথাযোগ্য সঙ্গতি রক্ষা করিতে অক্ষম হন নাই। এই জন্যই মৃত্যুদিন পর্যন্ত সত্য সত্যই বঙ্কিমচন্দ্র "বাঁচিয়াছিলেন।"

মহৎ লেখকগণ কেবল যে সমাজের আনন্দবেদনাকে রূপ দেন, সমাজপ্রগতির আগে আগে চলেন, তাই নয়—তারা সমাজের ক্রমবিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করেন। এবং তা করতে পারেন তাঁদের গভীর সহানুভূতি এবং স্বচ্ছ ভবিষ্যৎ দৃষ্টির সাহায্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিপিনচন্দ্র একথাটিও স্পষ্ট করে বলে গেছেন। তিনি লিখেছেন,—

"তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) কোনও দিন চারিদিকের চিন্তার ও ভাবনার তরঙ্গপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তৃণের মতন ভাসিয়া চলেন নাই, এই প্রবাহকে ঠেলিয়া তাহার তরঙ্গভঙ্গের উপরে উঠিয়া তাহার মূল গতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াই, আপনি নিত্য নূতন রসে, নিত্যনূতন জ্ঞানে, নিত্যনূতন শক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন।......... শক্তিশালী মহাপুরুষেরা স্রোতে ভাসিয়া বেড়ান না, ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া স্রোতের শক্তি ও সভ্যতাকে মায়িক এবং অলীক বলিয়াও উড়াইয়া দেন না ; কিম্বা তটস্থ হইয়া তাহার চাঞ্চল্যের ও অমঙ্গলের সম্বন্ধে ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করেন না, কিন্তু স্রোতের মাঝখানে যাইয়া, আপনার শক্তি ও নিপুণতার দ্বারা, তাহারই বেগে তাহাকে নিজের সার্থকতা সাধনে ও জনসমাজের ইষ্টপথে পরিচালিত করেন। বাংলা দেশের আধুনিক চিন্তার বিকাশে, ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরকাল, বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্বদাই এই স্রোতের মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি।'......

সেই জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এমন কালজয়ী। সত্তর আশী বছরের ব্যবধানেও তা অম্লান রয়ে গেছে। মনে হয়, যতো দিন যাবে, যতো আমরা তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করব ততোই বৃদ্ধির দিকে যাবে সে প্রভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন সার্থক হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের ঋষি। কিন্তু ঋষি বলতে আমাদের মনে যে চিত্র ভেসে ওঠে, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে কি? প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, সাদৃশ্য বিশেষ কিছু নেই। কেননা, ঋষিরা প্রাচীন ভারতের মানুষ, বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এ দুয়ের মধ্যে চেহারা, আচার ব্যবহার এবং জীবনযাত্রায় বিস্তর পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে বৈসাদৃশ্য অত্যন্তই বাহিরের ব্যাপার। অন্তরের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য অনেক বেশি।

আসলে ঋষিতে এবং সাধুতে আমরা অভেদ কল্পনা করি, সেইখানেই প্রধান অসুবিধা। সাধুর জীবন পবিত্র, তিনি নিজের মুক্তির জন্যে সাধনা করেন। কিন্তু ঋষি পবিত্র জীবনের অধিকারী না হতেও পারেন। তাঁর গৌরব, মানবজাতির পক্ষে মঙ্গলজনক কোনো মন্ত্রের দর্শন ও প্রচারে। তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি প্রখর, মানবসমাজের চাহিদার বিষয়ে অনুভূতি অতি তীক্ষ্ম এবং তিনি প্রতিভাবান পুরুষ। এই সব

অলৌকিক ক্ষমতার প্রসাদে তিনি এমন কিছু প্রত্যক্ষ করেন যা সকলেরই মনে প্রতিধ্বনি তোলে, সকলকেই কর্মোন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও ঠিক এই জিনিসই প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি আমাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্রথম মন্ত্রদাতা, জন্মভূমিকে আরাধ্য দেবতার মতো বন্দনা করতে বলে তিনি উচ্চারণ করেছেন প্রথম—'বন্দেমাতরম্'! তিনি আমাদের পুঞ্জীভূত আবেগের ভাষা দিয়েছেন, নতুন কর্মযোগে দীক্ষিত করেছেন—এই জন্যেই তিনি ঋষি, মন্ত্রদ্রষ্টা।

কিন্তু সেই সঙ্গেই প্রশ্ন জাগে, তবে কি তিনি সাহিত্যিক নন? অথবা, সাহিত্যিকের চেয়ে ঋষিত্বই তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য?

এ জিজ্ঞাসাও কিছুটা অবান্তর। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে এই দুটি গুণ পরস্পর প্রতিযোগী নয়, সম্পূরক। সাহিত্যিক গুণাবলীই তাঁকে মানুষ ভালবাসার, দেশকে শ্রদ্ধা করার ক্ষমতা দিয়েছে। এবং তিনি যে মন্ত্র আমাদের জন্যে রেখে গেছেন, তারও প্রভাব বিস্তৃত হ'য়েছে আমাদের মনে সাহিত্যের ভিতর দিয়েই। অন্যদিকে ঋষির মতো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলেই সাহিত্যকর্মকেও তিনি সত্য-প্রতিষ্ঠা ও লোকহিতৈষণার মহৎ লক্ষ্যে নিযুক্ত রাখতে পেরেছিলেন।

কাজেই বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলেই ঋষি, এবং ঋষির ক্ষমতা ছিল বলেই তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

কিন্তু তিনি যে মূলত একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন সেইটেই আমাদের বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করার বিষয়।

সত্যদর্শন এবং সত্যের আবিষ্কার তো দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সকলেরই সাধারণ লক্ষ্য। যে উপায়ে তিনি সে লক্ষ্যে উপনীত হন, মাধ্যমের সেই উপাদানের নামেই জনসমাজে তিনি পরিচিত হন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অবলম্বন ছিল সাহিত্য। কাজেই সাহিত্যিক, এই গৌরবই তিনি কামনা করেছিলেন, আমরাও তাঁকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে গৌরবান্বিত বোধ করি।

বাংলা সাহিত্যের জন্যে আজীবন তিনি কী করেছেন, অজস্র বলেও সেকথা শেষ হয় না। যাঁরাই বাংলা সাহিত্য অনুধাবন করেছেন তাঁরাই বুঝেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া বাংলা সাহিত্যের কথা কল্পনাও করা যায় না।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর নিজের কীর্তি গগনস্পর্শী হলেও তিনি যে অধিকতর উন্নতির জন্যে পথ খুলে দিয়ে গেছেন, সেই ভগীরথের মতো যুগ-প্রবর্তনাই তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধি।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার চেয়ে ভালোভাবে আর কিছু বলা সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন—

"একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্মসংকীর্তন করিবার উপযোগী; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহা বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিনী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দু'দশকের মধ্যেই যে এ রাগিনী সত্যিই বিশ্বসভায় পৌঁছেছে, সেকথা আমরা সকলেই জানি। সে গৌরব রবীন্দ্রনাথের। তাই রবীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর পূর্বসূরীর প্রতি এই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন কালজয়ী হ'য়ে থাকবে। বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান।

প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের সংঘাত ও সংশ্লেষে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশাল বিচিত্র দীপাশিখায় এদেশের নব-জাগ্রত চেতনার যে বিস্ময়দীপ্তি দেখা দিয়েছিল, এযুগের সাহিত্যের আদিগুরু বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই তার বাণীমূর্তি। তাঁর জন্ম বাংলাদেশে কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের নবউদ্বুদ্ধ আত্মা তাঁর লেখনীতে বাঙ্ময়। বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ প্রতিভা যে ভিত্তি রচনা করে গেছে বর্তমান বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য অনেকাংশে তারই ওপর প্রতিষ্ঠিত। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের আলোচনার প্রয়োজন তাই অবিসংবাদিত। এক হিসাবে প্রতিভাশালীদের জীবন ও সৃষ্টি অবিচ্ছেদ্য। ''বঙ্কিমচন্দ্রঃ জীবন ও সাহিত্য'' গ্রন্থটিতে মহৎ সৃষ্টির পশ্চাতে এই মহৎ জীবনের প্রেরণা সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত।